দেশের দুঃখী

শ্রীনিশাপতি মাঝি

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

ভূমিকা

শ্রীনিশাপতি মাঝি নানা সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বা বক্তৃতা দিয়াছেন, সেগুলি সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাকে আমি বিগত আঠারো বৎসর ধরিয়া চিনি এবং প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, যখন তিনি বোলপুর শহরে মদ্যপান নিবারণের জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কারণ সেই সমাজের মানুষ হইয়া তিনি উহার দুঃখ-বেদনা ও অবহেলা-অপমান গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বহুদিন বিশ্বভারতীর পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অভিজ্ঞ আদর্শবাদী কর্মীগণের সংস্পর্শে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহা তাঁহাকে রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় পাঠক বর্তমান প্রবন্ধগুলি পড়িয়া বাংলা দেশের সমাজে দুর্বল অঙ্গগুলির সম্পর্কে আরও সচেতন হইবেন এবং তৎপরতার সহিত সেই দুর্বলতাকে দূর করিয়া দেশে শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারিবেন।

৩৭ বোসপাড়া লেন
কলিকাতা-৩
১১-৮-৪৮

শ্রীনির্মলকুমার বসু

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ

সূচী

মহাত্মাজী ও তাঁর পরিকল্পনা ... ৩
অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ ... ৭
তপশীলদের কয়েকটি জাতির সংখ্যা ... ১৬
অস্পৃশ্যতা-বর্জন বিল ... ১৭
পশ্চিম-বাংলার জনসংখ্যা ... ৩৫
অধিক উৎপাদন ... ৩৬
চাষী, ছুতার, কামার ও তাঁতী ... ৪৪
মেয়েদের কাজ ... ৫২
হরিজনদের হাতের কাজ ... ৫৯
হরিজন সম্মেলনের অভিভাষণ ... ৬৮
পশ্চিম-বাংলার অস্পৃশ্যতার রূপ ... ৭৮
জমিদারী উচ্ছেদ ও চাষী-মজুরের দাবি ... ৮১
বর্ধমান জেলা দোকান-কর্মচারী সম্মেলন ... ৯০
পচুই মদ কি খাদ্য ? ... ৯৫
স্বাধীন পশ্চিম-বাংলার সেনাবাহিনী ... ১০২
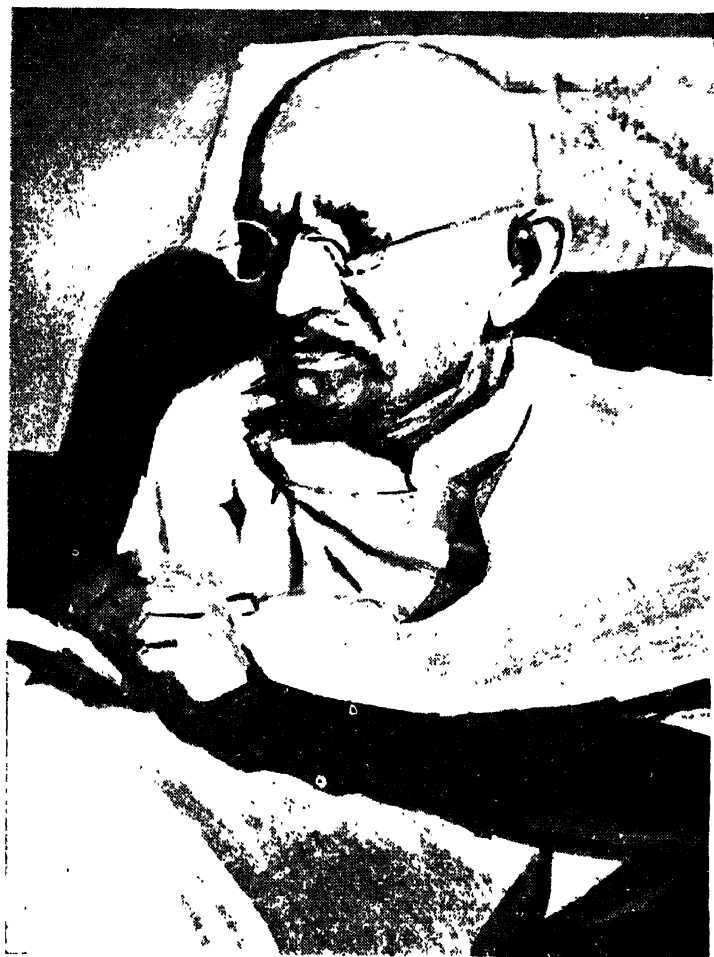
মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজী ও তাঁর পরিকল্পনা

ভারতের তপোবনে তপস্বীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজী মৃত্যুকে অবহেলা ক'রে জাগ্রত ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, পৃথিবীতে যখন হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও লোভ প্রবল হয়ে উঠল, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে গেলেন। তবু ভরসা ছিল মহাত্মাজী আমাদের মাঝে আমাদের তপোবনে বিরাজ করছেন। কিন্তু বিগত ৩০শে জানুয়ারি একজন আততায়ী মহাত্মাকে প্রার্থনার সময় আঘাত করে সে সাধেও বাদ সাধলে। মহাত্মাজী এ নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে পারলেন না; আজ এই ভারতের তপোবন নীরব; দুঃখ, লজ্জা ও অপমানে ভারত শোকাভিভূত।

আজ গভীর ভাবে অনুভব করবার দিন মহাত্মার সেই সব পরিকল্পনা, যেগুলো এতদিন ধ'রে কারাগারে লোকচক্ষুর অন্তরালে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কেন না, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যই মহাত্মাজী বিপ্লবী হয়ে, বিদ্রোহী হয়ে রাষ্ট্রকে এবং সমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, সকলে তাঁর সেই অমর বাণী কান পেতে শোনে নি। তবু একচল্লিশ কোটী লোকের মধ্যে কয়েক লক্ষকে নিয়ে মহাত্মাজী রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঘোষণা করেন। সেদিন বিশ্ববাসী তাঁর এ অদম্য সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। কিন্তু অহিংসা-মন্ত্রের সাধক সেনাপতিরূপে যে দিন পঁচিশ বৎসর পর ১৫ই আগস্ট আমাদের হাতে আমাদের দেশকে তুলে দিলেন, সেদিন আমরা

এই নির্বিকার মহাপুরুষের পদধূলি নিয়ে ধন্য হয়েছিলাম। সেদিন তিনি এই কলিকাতা নগরীতেই মিলন সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

বাংলা মহাত্মাজীকে কতখানি গ্রহণ করেছে আজকে হয়তো সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে বাংলাতেই মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতাবর্জন-বৃক্ষ আজ ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তাই আশা হয় বাংলাতেই হরিজনগণ অস্পৃশ্যতাকে দশ বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদ ক'রে মহাত্মাজীর পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলবে।

হরিজনদের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তিনি এই বাংলাতেই বার বার দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করেছেন। ১৩ জনের স্থলে বাংলার তপশীল পরিষদ-সদস্যের সংখ্যা তিনিই ৩০ জন স্থির ক'রে দিয়েছিলেন। সেইরূপ ভারতীয় গণ-পরিষদে তিনিই নির্দেশ দান করেছিলেন যে, অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডযোগ্য ব'লে ঘোষণা করতে হবে। তাঁর নির্দেশেই বিভিন্ন প্রদেশে হরিজন-উন্নয়ন কাজ, মাদকদ্রব্য-বর্জন এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জন বিল কার্য্যকরী হতে চলেছে। বোধ হয় এই কারণেই পল্লী সংগঠন এবং দুর্গত-সেবা বিভাগের সঙ্গে হরিজন-উন্নযন কাজের দপ্তর কেন্দ্রীয় পরিষদে কার্যকরী হয়েছে।

আজ বঙ্গীয় সরকার "হরিজন-উন্নয়ন-বিভাগ" কেন্দ্রীয় পরিষদের ন্যায় স্থাপন করবার বিষয় বিবেচনা করছেন। বিগত অধিবেশনেই অস্পৃশ্যতা-বর্জন এবং গ্রাম-পঞ্চায়েৎ বিল প্রণয়ন ক'রে মহাত্মার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার কথা স্থির হয়েছিল। নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি ব'লেই আমরা মহাত্মার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

পশ্চিম-বাংলার অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অর্থাভাব এবং দলাদলিই প্রধান সমস্যা। পল্লীদরদী মহাত্মাজী পল্লী-সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ

পরিকল্পনা যা কংগ্রেসকে দিয়েছিলেন, তা দলিলস্বরূপ নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-সম্পাদক মহাশয় দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করেছেন। পল্লীতে পঞ্চায়েৎ কমিটি, ব্রতী দল, পল্লী-নায়ক এবং অধিনায়ক স্থির ক'রে আমাদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে আজ অগ্রবর্তী হতে হবে। পশ্চিম-বাংলার প্রায় ৩৫ হাজার পল্লীতে যদি এইরূপ স্বাধীনতা রক্ষার ব্যূহ্ নির্মিত হয়, তা হ'লে সত্যিই আমরা পল্লীর উপকার সাধনে সক্ষম হতে পারব। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে, ভারতের তপোবনের ন্যায় একটি গৃহ নির্মাণ করবার যে আশা দিয়েছিলেন তাও সার্থক হতে পারবে। আজ বিশ্ববাসী সাগরের ওপার থেকে এ-পারকে ধিক্কার দিচ্ছে। আজও যদি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ভারতের প্রত্যেক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদ মহাত্মাজীর পরিকল্পনাকে কার্যকরী না করেন, তা হ'লে তাঁর প্রচণ্ড সংকল্পকে জাতি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারবে কি ?

অপরাধ অনেক করা হয়েছে। এজন্যই পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর হত্যার গ্লানিতে আমাদের হাজার হাজার বছরের জন্য জগতের কাছে ছোট হয়ে থাকতে হ'ল। দুঃখ হয়, যদি তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রাপ্য সম্মান আমরা তাঁকে দিতে পারতাম, তা হ'লে আরও কিছুদিন তিনি সংগঠনকার্যে স্রষ্টারূপে বিরাজ করতেন।

স্রষ্টার সম্মুখে আমাদের ব্রত গ্রহণ করবার শুভদিন উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি কাজের জন্যই আমাদের সম্মুখ থেকে অদূরে অবস্থান করছেন। আসুন, আজ আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি, তিনি যে অধিকার আমাদের দিতে বলেছিলেন, আমরা সেই অধিকার সকলে মিলে সকলকে দান করব। যে এ কাজে পশ্চাৎপদ হবে তাকে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হব না ; ভাই হয়ে ভাইকে গ্রহণ করতে

জীর্ণ সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। এ কাজে ভীরুতাকে আশ্রয় ক'রে আর কাউকে ক্ষমা করব না, নতুবা মহাত্মাজীর প্রায়শ্চিত্তে জাতির প্রায়শ্চিত্ত হবে না। লোকভয় সমাজভয় ও মৃত্যুভয়কে পদদলিত ক'রে যদি আমরা এগিয়ে চলতে পারি, এ কাজে পরাভব ও পরাজয় ঘটতে না দিই, তা হ'লে সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত হয়ে বলবে—জয় হয়েছে গান্ধীজী, আপনার সাধনা।

(পশ্চিম-বঙ্গ পরিষদে পঠিত)

"পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ।
যাদের জীবন ছিল ব্যবসার পণ্য,
শোষণে শোষণে যারা জীর্ণ,
তুমি তাহাদের লাগি অনুখন ছিলে জাগি,
অহিংস-পন্থায় শান্তির অনুরাগী—
পুড়ালে জীবন-দীপ সত্যের আলো মাগি
সংশয়-কালো করি দীর্ণ।
পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ॥"

—সজনীকান্ত দাস

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ

ভারতীয় গণ-পরিষৎ মৌলিক অধিকারবলে যে অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই পরিষদ অন্তরের সহিত ভারতীয় গণ-পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতীয় গণ-পরিষদের ঘোষণাকে আইনত কার্যকরী ও অস্পৃশ্যতাবর্জনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সরকার হইতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক—ইহাই এই পরিষদের অভিমত। পশ্চিম-বঙ্গবাসীকে অস্পৃশ্যতা-বর্জনকার্যে নিযুক্ত হইয়া সমাজ-জীবনকে প্রাণবন্ত, সুষ্ঠু ও সজীব করিয়া তুলিবার জন্য এই পরিষদ দেশবাসীকে আবেদন জানাইতেছে।

অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং তপশীলদের উন্নতিকল্পে, এ দেশে বিদেশীরা ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা হয়তো হরিজনদের রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার দানের আংশিক বিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে প্রকৃত মিলনের কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই। ভেদনীতির দ্বারা বিদেশী শাসনকে কায়েম হইতে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী এই কারণেই হরিজন-আন্দোলন সৃজন করেন। তিনি ঐকান্তিক ভাবে বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে যোগসূত্রটি অক্ষুণ্ণ না রাখিলে এই ব্যাপারে আজিকার জাতীয় সরকারকে আরো বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইত। এ ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারের পথে আমাদিগকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আনন্দের সহিত এই জন্য ভারতের গণ-পরিষদকে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং অস্পৃশ্যতা-পাপকে উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবগত হইয়াছি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব মাননীয়া রাজকুমারী অমৃত কাউর অবিলম্বে প্রত্যেক প্রদেশে হরিজন-উন্নয়নকার্যের জন্য একটি করিয়া বিভাগ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আজ পশ্চিম-বাংলার পরিষদ-সদস্য মহোদয়ের এই জন্য সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মাননীয় সদস্যগণ নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া পশ্চিম-বাংলার প্রায় ৪৫ লক্ষ হরিজনের উন্নয়নকার্যের ভার গ্রহণ করিলে সত্যই দেশ ধন্য হইবে। ইহাতে পশ্চাৎপদ জাতিগুলি ভারত সরকারের পরিকল্পিত কৃষি-শিল্প-উন্নয়নকার্যের আংশিক কার্যভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

প্রস্তাবের পটভূমিকায় আমি এই সূত্রে বলিতেছি যে, হরিজন উন্নয়নের অর্থ মাদ্রাজের ১৯৩৭, ৩৮ এবং ৪৭ সালের মন্দির-প্রবেশ-আইন নহে। পশ্চিম-বাংলার অস্পৃশ্য অনুন্নত এবং তপশীলদের আইনত সামাজিক সমানাধিকার দিবার জন্য যদিও কোন আইন আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই, তবুও এখানকার সামাজিক জীবনে চলাফেরার কোন গুরুতর ব্যবধান হরিজন ও বর্ণহিন্দুদিগের মধ্যে নাই। এ কথা বলিতে আমি গর্বানুভব করি যে, ভারতের কোন একটি প্রদেশের ন্যায় পশ্চিম-বাংলার হরিজনদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া রাস্তার এক ধার দিয়া চলিবার প্রথা কোন কালে এখানে ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, শ্রীচৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং শিক্ষক ছাত্র ও দেশকর্মীগণ তথা সাহিত্যিকগণ অস্পৃশ্যতার বিষবৃক্ষের মূলে যে পরিমাণ কুঠারঘাত করিয়াছেন, এইবার জাতীয় সরকারের সামান্য আঘাতেই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। পশ্চিম-বাংলার জনগণ এই বিষয়টির প্রতি এত বেশি উদ্যোগী ও আগ্রহশীল এবং আমার প্রিয় দেশ-বাসী এরূপ প্রগতিশীল যে, যে কোন একটি আইন বিধিবদ্ধ হইলেই

তাহা হরিজনদের মন হইতে সেকালের প্রকৃত এবং কাল্পনিক ভীতি, সঙ্কোচ এবং বর্ণহিন্দুদের সম্মুখের তুচ্ছ সামাজিক বাধা ও চক্ষুলজ্জা দূর করিতে সমর্থ হইবেই।

এই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি, আগামী ১৯৪৮ সালের যে বাজেট-অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে মাদ্রাজের গ্রামপঞ্চায়েৎ আইনের ন্যায় যেন একটি বিল উপস্থিত করা হয়। এই বিলের সাহায্যে গ্রামের সকল শাসনভার এবং সংগঠনকার্যের দায়িত্ব যেমন গ্রামপঞ্চায়েৎসমূহের উপর ন্যস্ত থাকিবে, সেইরূপ অসম্মত ব্যক্তিদের গ্রামের পঞ্চায়েৎগণই দণ্ডদানের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া অস্পৃশ্যতাবর্জন-কার্যকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। পঞ্চায়েৎগণ ২৫০৲ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দিবার অধিকারী হইবেন। ইহার কাঠামো কিরূপ হইবে তাহা চূড়ান্ত ভাবে স্থির করিবার জন্য মাননীয় আইন-সচিব মহাশয়কে সর্ব দলের নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। আমি মাদ্রাজের পল্লী-পঞ্চায়েৎ আইনে যে সকল দণ্ডদানের বিধিব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি—

(১) কোন পুরোহিত ও মন্দিররক্ষক মন্দির প্রবেশে বাধা দিতে পারিবে না।

(২) কোন নাপিত চুল কাটিতে এবং কোন ধোপা কাপড় কাচিতে অসম্মত হইতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি পদবী ব্যবহার না করিয়া জাতির নাম উল্লেখ করিতে এবং অযোগ্য সম্বোধনে অপমানিত করিতে পারিবে না।

(৪) হোটেলওয়ালা; মিষ্টান্নবিক্রেতা বা কোন খাদ্যদ্রব্যবিক্রেতা

স্পর্শদোষের ভয়ে দূর হইতে খাদ্যদ্রব্য ছুঁড়িয়া দিতে বা ঘটি হইতে জল মুখে ঢালিয়া দিতে পারিবে না।

(৫) (ক) কোন ব্যক্তি গোয়ালে বসাইয়া অথবা খারাপ স্থানে মজুর মাহিন্দার ভাগীদার চাকর চাকরাণীকে পচা, বাসী বা অখাদ্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান্ করিয়া স্বাস্থ্যহানিকর কার্য করিতে পারিবে না। এবং

(খ) কোন ব্যক্তি নর-নারায়ণ ভোজন, সর্বজনীন পূজা, উৎসব প্রভৃতি এবং কাঙালীভোজন প্রভৃতির আয়োজন করিয়া রাস্তার ধারে পচা ড্রেনের পাশে নোংরা স্থানে খাইতে দিতে পারিবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইতে বাধ্য করিতে অথবা সংগ্রহ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না।

(৭) কোন ব্যক্তি নিজেকে ভদ্রলোক ভাবিয়া অন্যকে ছোটলোক বলিয়া তিরস্কার, অপমান ও প্রহার করিতে অথবা গ্রাম হইতে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করিতে অথবা মানহানির উত্তেজনা সৃজন করিয়া অন্যায়কারীকে সাহায্য করিতে পারিবে না।

যাহারা উপরিলিখিত ধারাগুলি অমান্য করিবে তাহাদিগকে পূর্বোক্ত যে কোন দণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করিবার অধিকার গ্রাম-পঞ্চায়েৎদের থাকিবে। অভিযোগকারীকে মামলার ফি বাবদ কিছুই দিতে হইবে না। কোন পক্ষেরই উকিল নিয়োগের অধিকার থাকিবে না। সাক্ষী সাবুদ জবানবন্দী লইয়া যে রায় পঞ্চায়েৎ দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে। তবে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ প্রকাশ্য আদালতে গুরুতর কতকগুলি কারণের জন্য আপীল করা চলিবে। ইহার পর আর কোনও আপীল চলিবে না।

পল্লীতে একটি প্রশ্ন উঠিবে যে, যে-সব মন্দির ও পূজানুষ্ঠান কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেই সব ক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে হরিজনদের

কোন অধিকার দেওয়া যায় কি না? এই সব মন্দির ও পূজানুষ্ঠানে চিরাচরিত প্রথানুসারে দেখা যায় যে, আহূত অনাহূত ও রবাহূত সকল শ্রেণীর লোকই সেখানে সাধারণত প্রবেশাধিকার পায়, কাজেই হরিজনরাই বা পাইবে না কেন? ব্যক্তিগত পুষ্করিণীতে যেমন জনসাধারণের ঘাটস্বত্ব প্রচলিত আছে এবং জনসাধারণের জল ব্যবহার্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই সকল মন্দির ও পূজানুষ্ঠানেও তেমনি হরিজনদের প্রবেশাধিকার ও পূজাস্বত্ব আছে কি না, আমি পরিষদকে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

পায়খানা, নর্দমা এবং ময়লা পরিষ্কার, চামড়া তৈরি ও গ্রাম পরিষ্কার কার্যে যাহারা নিযুক্ত আছে এবং ধাত্রীর কাজ যাহারা করিতেছে তাহাদের সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আমি মাননীয় সদস্যগণের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। অনায়াসেই ইউনিয়ন বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটির দ্বারা ইহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। সুখের বিষয় যে, ইহারা অনেকেই আধা-সরকারী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা প্রতিষ্ঠানভুক্ত নহে, তাহাদেরও সমবায় সমিতি-দ্বারা সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার উপায় আছে।

ইহাদের কার্যকালীন পোশাক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরবরাহ করিবার এবং বাসগৃহ ও নলকূপসমূহ স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যদি প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি আদর্শ পল্লী স্থাপনে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত মৃত জন্তুর মাংসাহার আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। সেইরূপ মাদকদ্রব্যগুলির দ্বারা সরকার যাহাতে প্রায় ২ কোটি

৮০ লক্ষ টাকা আদায় না করেন এবং মাদক দ্রব্যের বহুলপ্রচার বন্ধের জন্য কঠোর বিধিব্যবস্থা করেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কেন না, শত-করা ৯৫ জন বর্তমানে মাদক দ্রব্যের প্রতি অনুরক্ত। বঙ্গীয় সরকারের ১৯৪৬—৪৭ সালের বাজেটের ১৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, পশ্চিম-বঙ্গে গৃহে ও গ্রামে গ্রামে তৈরি পচুই মদ বাবদ ৩ লক্ষ ২১ হাজার এবং ৩৩ লক্ষ ২৪ হাজার একুনে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা আবগারী থাতে আয় হইয়াছে। সেইরূপ তাড়ি বাবদ ১৩ লক্ষ টাকার গাছের খাজনা ও দোকানের লাইসেন্স ফি আদায় হইয়াছে। ইহাতে শুধু তালগুড ও মিছরি তৈযারি কার্যের শত্রুতা সাধন করা হইতেছে না, হরিজনের খাদ্যদ্রব্য সমস্যারও গুরুতর সর্বনাশ সাধন কবা হইতেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে যেমন দৃঢ় চিত্তে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তেমনি কঠোর হস্তে পচুই মদ ও তাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিশেষ পুলিস নিযুক্ত করিয়া মাতালদের সংখ্যা হ্রাস করা দরকার।

বিদেশী শাসনকর্তারা সাঁওতাল-বিদ্রোহের পর সাঁওতালদিগকে এবং রায়বেঁশেদিগকে স্বাধীন বাংলার সৈনিক বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে দুর্বল ও নিস্তেজ করিবার জন্য পচুই মদ ও তাড়ির ভেণ্ডার নিযুক্ত ও নানা কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সময় আসিয়াছে, সেই সব ছল বল ও কৌশল পরিত্যাগ করিয়া জাতির চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমার প্রস্তাবগুলিকে বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। ইতিমধ্যে কেহ কেহ হরিজন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে শুনিয়া বিরক্ত হইযা পড়িতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাত্মা গান্ধী জীবনের

শেষ দিন পর্যন্ত 'হরিজন' পত্রিকা এবং হরিজন-সেবা-সঙ্ঘ এবং হরিজন-উন্নয়নের কাজকে উল্টাইয়া দেন নাই। উপরন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান পূর্ণোদ্যমে হরিজনদের জীবনের মানদণ্ডকে উচ্চ করিবার জন্য অধিকতর আগ্রহশীল হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত মাননীয় সদস্য মহাশয়গণ বোধ হয় জানেন যে, এই ভেদবুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা-পাপ হরিজনদের মধ্যেও প্রবলভাবে বর্তমান। অস্পৃশ্যতা-পাপ হরিজনদের স্তরে স্তরে বর্তমানে অধিকতর প্রবল পরাক্রমে ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। তাহা যে কবে দূর হইবে, তাহা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। এই কারণে আজিকার সবল ও সক্রিয় সামাজিক জীবন গঠনের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের স্বাধীন নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সহায়তাপ্রার্থী হইয়াছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্ত্রীলোকেরা গৃহের কর্ত্রী হইয়াও যেমন ভিতর হইতে আজও অস্পৃশ্যতাকে দূরীভূত করিতে পারেন নাই, সেইরূপ আমাদের রাষ্ট্রকেও নানা সমস্যায় আকুল হইয়া পড়িতে হইতেছে। অবগত হইয়াছি যে, বাংলা দেশে লীগমন্ত্রীগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকার তপশীলীদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবে ১৯৪৫-৪৬ সালের ন্যায়ই মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৫ই আগস্টের পর ১৯৪৭-৪৮ সালের বর্তমান সময়ে উক্ত ৫ লক্ষ টাকাকে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় মুসলমান, মহিলা এবং পশ্চাৎপদ হরিজনদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা অবগত হইয়া আমরা বিচলিত হই নাই, তবে তিনি এ বিষয়ে পরিষদ-সদস্যগণের সহিত এবং অর্থ-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আজ পর্যন্ত কোন পরামর্শ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই বলিয়াই বিস্মিত হইয়াছি। শুনিতেছি, কলিকাতার ছাত্রাবাসসমূহে ২০০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৪২ জন তপশীল ছাত্রের স্থান দেওয়া

হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবিদদের নিকট আমার নিবেদন যে, যখন ১০ বৎসরের মধ্যে তপশীল আখ্যা অবলুপ্ত হইবে তখন যাহারা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এবং অনুন্নত তাহাদের যোগ্যতর করিবার গুরুদায়িত্বভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সকলের জন্য যে শিশুশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইবে, তাহার বৈশিষ্ট্য ও গতিভঙ্গীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হরিজন-শিশুরা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া যে অশিক্ষার গহ্বরে রহিয়াছে, মাত্র চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে আনিয়া, সহজে তাহাদের কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটানো যাইবে না। তাহাদের হাতেনাতে সর্বদা কাজ করাইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করাইতে হইবে এবং সুশিক্ষার সাহায্যে নির্বুদ্ধিতার বিনাশসাধন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত গ্রামে গ্রামে বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে মাদকদ্রব্যের ঘাঁটিগুলি বন্ধ হয়, জুয়াখেলা উচ্ছেদ হয় এবং হরিজন-স্ত্রীলোকদেরও মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলিতেছি যে, কারিগরি, কৃষি, ডাক্তারী এবং বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষার এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রতি জেলায় বৎসরে অন্তত ১০ জন করিয়া তপশীলী সত্যকারের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। ম্যাট্রিক পাসের পর অনেককে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্রছাত্রী বলিয়া এই সকল উচ্চশিক্ষার স্থান হইতে বঞ্চিত করিলে হরিজনরা কোন প্রকারেই বর্তমানে যোগ্যতর হইতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেক বিদ্যালয়কে এইরূপভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা হরিজন-সমস্যার সমাধান হয়, তাহারা নূতন কিছু আবিষ্কার ও কর্মশক্তি অর্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বিদ্যালয়গুলিই জাতীয় চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করিবে,

নরনারীর চরিত্রকে রূপ দিবে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে পরস্পরের সহযোগিতায় দেশকে গড়িয়া তুলিবে। এইরূপ বহুমুখী কর্মের ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাব্রতীগণ এবং বিদ্যালয়গুলিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। বিদ্যালয়েই যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধান হইবে।

আজ তাই এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলিতেছি, গণতন্ত্র ও সাম্যের নীতিতে পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র অতি সত্বর হরিজন-উন্নয়ন বিভাগ স্থাপন করুন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উড়িষ্যার সরকারসমূহ যেরূপ কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া হরিজনদের উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, আজ সেই আদর্শের ঊর্ধ্বেও পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র নব-আলোকপাত করিয়া ভারতকে আলোকিত করুন। নেতাজীর স্বদেশে—রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে—আমরা এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করি।

(পশ্চিম-বঙ্গ পরিষদে পঠিত, ৯ই জানুয়ারি ১৯৪৮)

তপশীলদের কয়েকটি জাতির সংখ্যা

	জাতি	শ্রেণী	সংখ্যা
১	বাগদী জাতি বা বর্গক্ষত্রিয়	৫টি	৯ লক্ষ ৮৭ হাজার
২	জালিয়া কৈবর্ত বা বৈশ্য	৪টি	৩ লক্ষ ৫২ হাজার
৩	ভূমিজ (খাঁটি অস্পৃশ্য)	৪টি	৮৫ হাজার
৪	ভূঁইয়া (” ”)	৪টি	৪৯ হাজার
৫	ধোপা বা রজক	৪টি	২ লক্ষ ২৯ হাজার
৬	দোসাদ (খাঁটি অস্পৃশ্য)	১টি	৩৬ হাজার
৭	ডোম বা বীরবংশী	৬টি	১ লক্ষ ৪০ হাজার
৮	হাড়ি (হাজরা)	৫টি	১ লক্ষ ৩০ হাজার
৯	কাপালি (ক্ষত্রিয়)	১টি	১ লক্ষ ৬৫ হাজার
১০	কোড়া (আদিবাসী)	৪টি	৪৯ হাজার
১১	সাঁওতাল (আদিবাসী)	৪টি	৭ লক্ষ ৯৬ হাজার
১২	বাউরী (যোদ্ধাজাতি)	৪টি	৩ লক্ষ ৩ হাজার
১৩	মুচি (ঋষি)	৪টি	৪ লক্ষ ১৪ হাজার
১৪	মেথর (খাঁটি অস্পৃশ্য)	১টি	৭ হাজার
১৫	মাল (” ”)	২টি	১ লক্ষ ১১ হাজার
১৬	শুঁড়ি বা সাহা	৪টি	৩ লক্ষ ৬৭ হাজার

এই সব ছাড়াও হরিজনদের আরও অন্যান্য শ্রেণী আছে। এই রকম প্রায় ৩০০টি উপজাতি বা শ্রেণীবিভাগ হবার কারণ কি ? পুরাণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যত বর্ণ আছে সমস্তই বর্ণসঙ্কর ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। আরও দেখা যায় শূদ্রের মাঝেও শ্রেণী-বিভাগ আছে,—(১) ম্লেচ্ছ শূদ্র, যথা—যুগী ও মাল কসাই। (২) খাঁটি অস্পৃশ্য শূদ্র—মুচি, হাড়ি, ডোম, মেথর ও গঙ্গাপুত্র। এবং (৩) নিম্ন-শূদ্র—ধোপা, তৈলকার, শুড়ি প্রভৃতি।

অস্পৃশ্যতা-বর্জন বিল

পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণার্থ ১৯৪৮ সালের অস্পৃশ্যতা-বর্জন-বিলের পাণ্ডুলিপি 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষদে মার্চ মাসে বিলটি উপস্থাপিত হইত; কিন্তু বিশেষ কারণে তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুর মধ্যে আজও যৎসামান্য সামাজিক অযোগ্যতা বিরাজমান। অবশ্য শিক্ষার শাণিত অস্ত্রে এই অস্পৃশ্যতা-ব্যাধি দূরীভূত হইবে, কিন্তু সেই অস্ত্র ব্যবহার করিবার জনমতের ও জনশক্তির বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। দশ বৎসরের মধ্যে শুধু প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হইলেই যথেষ্ট হইবে না—সমূলে অযোগ্যতাকে বিনাশ করিয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুকে যোগ্যতর করিয়া তুলিতে হইবে।

হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভাববর্ধন, বর্ণ ও মতনির্বিশেষে সকল হিন্দুকে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করিতে দিবার জন্যই পশ্চিম-বঙ্গের সরকার এই আইনটির পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছেন। ইহা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত হইলে, তৎপর কংগ্রেস-প্রদেশগুলিতে ইহার প্রভাব বিস্তার হইবে। এই বিলে সর্বসাধারণের আমোদ-প্রমোদের, উৎসবের, সর্বসাধারণের খাওয়াদাওয়ার স্থানের, মন্দিরের এবং পূজার্চনার স্থানে যে সব ভেদাভেদ বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রতিকারার্থ আইনত যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটি ১০টি ধারায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১০ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে "প্রাদেশিক সরকার এই আইনের বিধান কার্যকরী করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।" ইহা ব্যতীত বিলটি পরিষদ-সদস্যদের নিকট প্রচারিত

হওয়ায় ৪০টি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। পরিষদ-সেক্রেটারি মহাশয় তাহা সদস্যদের নিকট প্রচার করিয়াছেন। আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিষদ-সেক্রেটারির গোচরীভূত করিয়াছি।—

(১) সাঁওতাল ও আদিবাসীদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) উচ্ছিষ্ট খাদ্য বর্জন এবং ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রহাচার্য, পণ্ডিত প্রভৃতিকে সকল শ্রেণীর হিন্দুর ক্রিযাকর্ম করিবার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) ধর্মগ্রন্থাদি, গান, পদাবলী প্রভৃতি শ্রবণে যাহারা রবাহূত অনাহূত ও আহূত হইয়া দর্শক হইবে তাহাদের মধ্যে নিম্ন জাতি বলিয়া কাহাকেও পৃথক করা চলিবে না।

(৫) পংক্তি-ভোজনে কোনরূপ তারতম্য হইবে না এবং হিন্দু মাত্রই হিন্দুর সহিত আহারে ও বসবাসে, বিশ্রামে সম-অধিকার লাভ করিবে।

(৬) ব্যক্তিগত মন্দির ব্যতীত সর্বজনের ধর্মকার্য, সেবাকার্য ও জনশিক্ষার জন্য যাহা কিছু সম্পত্তি, মন্দির ও অর্থাদি উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মালিক স্থানীয় পঞ্চায়েৎগণই হইতে পারিবেন।

আমি এই বিলের ভূমিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে ভূমিকার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হইবে—

এবং যেহেতু এই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য হিন্দু সমাজের কোন কোন অংশে যে কতকগুলি সামাজিক অযোগ্যতা আছে, সেগুলি দূর করিবার নিমিত্ত অসম্মত ব্যক্তিদের সম্মত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা বিহিত—

বিশেষ করিয়া ৭৫টি তপশীল জাতির মধ্যেই অসম্মত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক। ৭৫টি জাতি বলিতে ৭৫টি তপশীল জাতি বুঝাইতেছে না। আরও ৪ দিয়া গুণ করিয়া ৩০টি জাতির পৃথক হুঁকা, পৃথক হাঁড়ি, পৃথক আসন, পৃথক্ পৃথক খাওয়াদাওয়া বুঝাইতেছে।

আজ তাই বলিতে হইতেছে, শিক্ষার আয়োজনে যদি সংকীর্ণতা স্থান পায়, তাহা হইলে অযোগ্যতা দূরীকরণ আইনের দ্বারা কোন সার্থকতা দেখা দিবে না। জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, ধনবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যদের স্পর্শদে যে আত্মশুদ্ধির মনোবৃত্তি যখন সমাজজীবনে স্থান পাইয়াছিল, তখন অশিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষার শাণিত অস্ত্রে এই ব্যাধিকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে বয়স্কদের মধ্যে মৌখিক শিক্ষার বিশেষ আয়োজন দেশে ছিল; কিন্তু দেখা যায় কথকতার গান শুনাইয়া তাঁহারা ভালভাবে ব্রাহ্মণকে উচ্চবর্ণ, ক্ষত্রিয়কে তন্নিম্নবর্ণ এবং বৈশ্যকে মধ্যমবর্ণ এবং শূদ্রকে সর্বনিম্নবর্ণে উপনীত করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে শাস্ত্রের নানা অপব্যাখ্যার দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণ বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত এবং শূদ্রের অন্ন অভক্ষ্য।

১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর দেখা যায়, এই সব অতীতের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার স্থান নাই। ন্যায়দণ্ড সকলের প্রতি সমান। বিষ্ণুসংহিতা এবং পরাশর-সংহিতায় (৫ম অধ্যায়, পৃ. ১০২) দেখা যাইতেছে অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। এইরূপ বধ্যভূমিতে পশ্চিম-বাংলায় আজ আর কেহই উপনীত হইতেছে না। আজ যদি তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ এবং পূজার্চনার সময় কোন কাজ করিতে কেহ অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে শিক্ষার অস্ত্রকে শাণিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার অজ্ঞান অহংকারকে

দূরীভূত করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ধূর্ত অসম্মত ব্যক্তিদের ছল বল কৌশল এবং আইনের নানা জটিল পরিস্থিতি সৃজন করিবার বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট রহিয়াছে। এইজন্য এক দল লোক নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কেবল শিক্ষা বিস্তারের কথা বলিতেছেন। তাহাদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এবং শিক্ষাবিস্তারমূলক অন্যান্য আইনের নিয়মকানুনের নিম্নলিখিত সংশোধন প্রয়োজন—

(১) যদি কোন অভিভাবক অথবা গ্রামের পঞ্চায়েতের অথবা শিক্ষা-বিভাগের কর্মীর দোষে স্কুলে যাইবার উপযোগী বয়সের ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে দণ্ডের বিহিত করা হইবে।

(২) যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষা-বিভাগ নানা অজুহাত সৃজন করিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত করেন,

(৩) অথবা বিদ্যালয় কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষার আয়োজন করিয়াছেন প্রমাণিত হয়,

(৪) অথবা ডাক্তারী, কৃষিবিদ্যা, কারিগরী শিক্ষায় সর্বাগ্রে পশ্চাৎ-পদদের বৃত্তি এবং সাহায্য করিতে অক্ষমতা জানাইয়া আত্মীয়তা বন্ধুত্ব এবং প্রভাব প্রতিপত্তির ষড়যন্ত্রজালে জড়িত হন,

(৫) অথবা ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ পাস করিয়া ছয় মাস হইতে দুই বৎসর জনশিক্ষা এবং বয়স্কদের শিক্ষাদানে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের এবং গেজেটেড অফিসারের পত্রাদি সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে সরকারী বেসরকারী কোন কার্যেই নিযুক্ত করা হইবে না।

(৬) অথবা যদি কোন ব্যক্তি লিখিত-পঠিত বিদ্যালাভ করিয়া

কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া সামাজিক অযোগ্যতা সকল প্রশ্রয় দিয়া নিজেকে স্পৃশ্য ভাবিয়া অস্পৃশ্যদের ঘৃণা অপমান অসম্মান করেন এবং হিন্দুজাতির সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণ বিলের ১০টি ধারার যে কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া তদন্ত দ্বারা গণ্য হন তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং সরকারী কাজ হইতে পদচ্যুত করা হইবে।

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অস্পৃশ্যতাকে বর্জন করিতে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে পতিত জাতির উদ্ধার করিবার জন্য অপমানের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে হাজারের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন নিজ আসন হইতে নিম্নে অবস্থান করিয়া নিম্নশ্রেণীদের উচ্চশ্রেণীযোগ্য করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হাজার-করা দশজনও উচ্চে অবস্থান করিবার জন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হন নাই। সামাজিক অধিকার লাভের জন্যও জাগ্রত হয় নাই। উপরন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করিয়া অনেক তপশীল হিন্দু, হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র হইবার ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুসলমানের ন্যায় স্বতন্ত্র ভোট এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য ডাঃ আম্বেদকর ইউরোপ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেসের সহিত আপোস করিয়া আজ অগ্রসর হইতেছেন। আশা করি যখন গণ-পরিষদ কর্তৃক আগামী শাসনতন্ত্র রচনাকার্য সম্পূর্ণ হইবে তখন তিনি নিশ্চয়ই হয় কংগ্রেসের অথবা সোসালিস্টদের সাহায্যের দ্বারাই নির্বাচিত হইবেন, এবং জগতকে সে আলোকে আলোকিত করিবেন।

পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র আমাদের যদি জমি জায়গা, যন্ত্র, অস্ত্র এবং সম্পদ সকল ফিরাইয়া দিবার বিহিত করেন, তাহা হইলে আমরা কি স্বাধীন

বাংলার সৈনিকের মত জীবনযাপন করিতে পারিব না? সৈনিকদের কোন কালেই কোন জাতিই অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে পারে নাই। আমরা যোদ্ধাজাতি হইয়া তবু কেন অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছি? আজ এই কথাটাই হরিজনদের এবং বর্ণহিন্দুদের ভাল কয়িয়া ভাবিতে হইবে। তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করি সকল সমস্যার সমাধান হইবে।—(আনন্দবাজারে প্রকাশিত)

পশ্চিম-বঙ্গ হিন্দুদের সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণার্থ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপি

হিন্দুদের কোন কোন অংশের কতকগুলি সামাজিক অযোগ্যতা দূর করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে একতা ও মিলনের ভাব বর্ধন এবং তদুদ্দেশ্যে হিন্দুদের কোন কোন অংশের কতকগুলি সামাজিক অযোগ্যতা দূর করিবার ব্যবস্থা করা বিহিত;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

১। (১) এই আইনটিকে পশ্চিম-বঙ্গ হিন্দুদের সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণার্থ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইবে।

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। এই আইনে বিষয় বা পূর্বাপর কথায় বিরুদ্ধ ভাবের কিছু না থাকিলে,—

(ক) "হিন্দু" বলিতে বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, আর্য বা ব্রাহ্মসমাজের লোক অথবা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি অথবা নিজেকে সচরাচর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এমন যে কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ;

(খ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" বলিতে সেনানিবাসের (ক্যান্টনমেণ্টের) কর্তৃপক্ষ অথবা কলিকাতার বন্দরপালগণ (পোর্টকমিশনার্স) ছাড়া অপর যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কথা বাংলার সাধারণ প্রকরণ বিষয়ক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের (বেঙ্গল জেনারাল ক্লজেস্ অ্যাক্ট) আইনের ৩ ধারার (২৩) প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে ;

(ধারা ৩।)

(গ) "সর্বসাধারণের আমোদপ্রমোদের স্থান" বলিতে যে স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থান, ঘেরা জায়গা, গৃহ, তাঁবু, চালাঘর কিংবা অন্য কোন রকমেব তৈরী জায়গায় বাদ্যাদি, সঙ্গীত, গান, নাচ কিংবা কোন প্রকারের আমোদপ্রমোদ কিংবা খেলাধূলা কিংবা এই সব করিবার ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে টাকা পয়সা লইয়া সর্বসাধারণকে ঢুকিতে দেওয়া হয় অথবা যাঁহাদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয় তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা পয়সা আদায় করা যাইবে এই উদ্দেশ্যে ঢুকিতে দেওয়া হয়, তাহার সমস্তই বুঝাইবে এবং মেলক (ফেয়ার), মেলা, ঘোড়-দৌড়ের স্থান, সার্কাস, সিনেমা, রঙ্গালয় (থিয়েটার), সঙ্গীত-গৃহ (মিউজিক হল), বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, ব্যাগাটেল খেলার ঘর, ব্যায়ামের স্থান বা অসিখেলা শিক্ষালয় এবং যে স্থান (স্টেডিয়াম, স্ট্যাণ্ড বা গ্যালারি) হইতে কোন খেলাধূলা বা প্রদর্শনী দেখিতে পারা যায় তাহাও বুঝাইবে ;

(ঘ) "সর্বসাধারণের খাওয়াদাওয়ার স্থান" বলিতে যে ঘেরা বা

খোলা স্থানে সর্বসাধারণকে ঢুকিতে দেওয়া হয় ও ঐরূপ স্থানের মালিকের বা ঐরূপ স্থানে কোন স্বার্থ আছে কিংবা ঐরূপ স্থানের কার্য-নির্বাহক কোন ব্যক্তির লাভ বা আয়ের উদ্দেশ্যে কোন রকমের খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় যোগান হয় সেই স্থান বুঝাইবে এবং জলখাবারের ঘর (রিফ্রেসমেণ্ট রুম), ভোজনালয়, কফিঘর, চায়ের দোকান, দৈনিক আহারের স্থান (বোর্ডিং হাউস), থাকিবার স্থান (লজিং হাউস) এবং হোটেলও বুঝাইবে ;

(ঙ) "দোকান" বলিতে যে গৃহাদিতে খুচরা বা পাইকারী দরে অথবা উভয় প্রকারেই জিনিসপত্র বিক্রয় করা হয় সেই গৃহাদি বুঝাইবে এবং ধোবিখানা (লণ্ড্রী), চুলকাটার ঘর বা ঐ প্রকারের অন্য যে স্থানে গ্রাহকদের জন্য কাজ করা হয় সেই স্থানও বুঝাইবে ;

(চ) "মন্দির" বলিতে যে স্থান, উহা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, হিন্দু সাধারণের ধর্মবিষয়ক পূজার্চনার জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে বা ঐরূপ পূজার্চনার সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে অথবা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐরূপ পূজার্চনার জন্য আপন অধিকারবলে ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই স্থান বুঝাইবে, এবং ঐরূপ স্থানের সংলগ্ন গৌণ দেবায়তন এবং মণ্ডপও বুঝাইবে ;

(ছ) পূজার্চনা বলিতে পূজার্চকদের অধিকাংশই যে ধর্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন তাহাই বুঝাইবে।

৩। কোন দলিলপত্রে বা আইনে, প্রথায় বা আচারে বিরুদ্ধভাবের যাহাই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই—

(ক) কোন আইনমতে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরি করার অযোগ্য হইবেন না, অথবা

(খ) নিম্নলিখিত কোন বিষয়ে কোন বাধা পাইবেন না :—

(/০) কোন মন্দিরে প্রবেশ করা অথবা পূজার্চনা করা ; অথবা

(৵০) যে নদী, স্রোতস্বিনী, ঝরনা, কূয়া, পুকুর, চৌবাচ্চা, জলের কল কিংবা জল লইবার অন্য কোন স্থান অথবা স্নানের স্থানে, শবের সমাধি বা দাহের স্থানে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক জিনিসে যে রাস্তা বা পথে প্রবেশ করিবার বা তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার অপর বর্ণের বা শ্রেণীর হিন্দুদের সাধারণত থাকে তাহাতে প্রবেশ করা বা তাহা ব্যবহার করা ; অথবা

(⁄১০) প্রাদেশিক সরকার কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভাড়া খাটার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত সাধারণের ব্যবহার্য কোন যান ইত্যাদিতে প্রবেশ করা বা তাহা ব্যবহার করা ; অথবা

(।০) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রাদেশিক রাজস্ব বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিলের সাহায্যে চলে এমন যে গৃহ বা স্থান দাতব্য উদ্দেশ্যে বা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে প্রবেশ করা বা তাহা ব্যবহার করা ; অথবা

(ধারা ৪—১০)

(।/০) সর্বসাধারণের আমোদপ্রমোদের বা খাওয়াদাওয়ার স্থানে প্রবেশ করা ; অথবা

(।৵০) যে দোকানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্য বর্ণ বা শ্রেণীর লোকদিগকে সাধারণত প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় সেই দোকানে প্রবেশ করা ; অথবা

(।⁄১০) হিন্দু সাধারণের ব্যবহারের জন্য পৃথককৃত বা রক্ষিত কোন স্থানে প্রবেশ করা বা তাহা ব্যবহার করা ; অথবা

(৷৹) হিন্দু সাধারণের উপকারের জন্য দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন ন্যাস হইতে কোন উপকার ভোগ করা।

৪। ৩ ধারার (খ) প্রকরণের (⁄৹), (৶৹), (।৹), (।⁄৹) (।৶৹) ও (।৵৹) উপপ্রকরণে উল্লিখিত কোন স্থানের অথবা উক্ত ধারার উক্ত প্রকরণের (৵৹) উপপ্রকরণে উল্লিখিত কোন যান ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন হিন্দু সম্পর্কে কোন বাধার সৃষ্টি করিবেন না অথবা এমনভাবে কোন কাজ করিবেন না যাহাতে কোন হিন্দুর বিরুদ্ধে তিনি কেবল কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত এই কারণে বৈষম্য করা হয়।

৫। হিন্দু আইনের অধীন বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় বিচারকালে অথবা কোন আদেশ পালনকালে, কোন আদালত যে প্রথা বা আচারবলে কোন হিন্দুকে, তিনি কেবল কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত এই কারণে কোন সামাজিক অযোগ্যতার অধীন করা হয় তাহা মানিবেন না।

৬। কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তাঁহাদের উপর কোন আইনমতে ন্যস্ত কার্য ও কর্তব্য সম্পাদনকালে, যে প্রথা বা আচারবলে কোন হিন্দুকে তিনি কেবল কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত এই কারণে কোন সামাজিক অযোগ্যতার অধীন করা হয় তাহা মানিবেন না।

৭। কেবল কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই কোন হিন্দুকে কোন স্কুলে, কলেজে বা অপর কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৮। (১) কেহ—

(ক) কোন হিন্দু কেবল কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে ৩ ধারার (খ) প্রকরণের (⁄৹), (৶৹), (।৹), (।⁄৹), (।৶৹)

ও (।৶০) উপপ্রকরণে উল্লিখিত কোন স্থানে কিংবা উক্ত ধারার উক্ত প্রকরণের (৶০) উপপ্রকরণে উল্লিখিত কোন যান ইত্যাদিতে প্রবেশ করিতে বাধা দিলে অথবা উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের (॥০) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন ন্যাস অনুসারে কোন উপকার ভোগ করিতে বাধা দিলে অথবা ঐরূপ বাধা দিতে প্রেরোচিত করিলে ; অথবা

(খ) ৪ কিংবা ৭ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত করিলে—

তিনি যদি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাঁহার তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে এবং তিনি সর্বসাধারণের আমোদপ্রমোদের অথবা খাওয়া-দাওয়ার যে স্থান অথবা যে দোকান সম্পর্কে ওই অপরাধ করা হয়, তাহার মালিক বা দখলকার হইলে. উক্তরূপ দণ্ড ছাড়াও তাঁহার ঐরূপ স্থান বা দোকান সম্পর্কে যে লাইসেন্স বা ছাড়পত্র (পারমিট) থাকে তাহাও বাতিল করা হইবে।

(২) (১) উপধারামতে কোন অপরাধ বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ৪ নং তপশীলের “ক” ভাগের অন্তর্গত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ আইনের বিধানমত উহার বিচার করা হইবে।

৯। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনমতে দণ্ডনীয় অপরাধ পুলিসের ধর্তব্য অপরাধ হইবে।

১০। প্রাদেশিক সরকার এই আইনের বিধান কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ

পশ্চিম-বঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের অধিবেশনে শ্রীনিশাপতি মাঝি মহাশয় অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন ও উহা গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য এই আইনের পাণ্ডুলিপিটি রচনা করা হইয়াছে। যাহাতে হিন্দুদের অংশবিশেষের বর্তমান কতকগুলি সামাজিক অযোগ্যতা দূরীভূত হয় এবং এই প্রদেশের সর্ববিধ লোকের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভাব বর্ধিত হয় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য।

পশ্চিম-বঙ্গ হিন্দুদের সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণার্থ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপি

সংশোধনী প্রস্তাব

২ ধারা

১। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (ক) ধারার ২য় ছত্রে "লোক" কথাটির পর "সাঁওতাল ও আদিবাসী" কথাগুলি বসিবে।

২। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (খ) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে: "(খখ) অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার স্থান বুঝাইতে যে স্থান নোংরা, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন স্থান তাহা বুঝাইবে এবং 'অস্বাস্থ্যকর খাদ্য' বুঝাইতে উচ্ছিষ্ট খাদ্য, দূষিত জল, নোংরা পাত্রে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও রন্ধনাদি করা এবং অপরিচ্ছন্নভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশন করা এবং ভ গাড়ে নিক্ষিপ্ত মাংসাদি বুঝাইবে।"

৩। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২(গ) ধারার "সর্ব-সাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

৪। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২(গ) ধারার তৃতীয় ছত্রে "সঙ্গীত" কথাটির পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে :—

"কীর্তন, কথকতা, রামায়ণ-গান, যাত্রা, কবি, বাউল, অভিনয়াদি এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠের সভাস্থান এবং পুরোহিতগণ যে স্থানে বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেন, শ্রাদ্ধসভায় যে স্থানে গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রহাচার্য ও পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকেন, এবং উপনয়ন, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশনের সভাস্থান, বাৎসরিক মাসিক বা দৈনিক পূজার্চনা ও উৎসব অনুষ্ঠানের স্থান।"

৫। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২(গ) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে : "(গগ) দর্শক ও উৎসব অনুষ্ঠান বলিতে ব্যক্তিগত পূজার্চনা স্থান ব্যতীত যাহা একাধিক ব্যক্তির চাঁদা, পরিশ্রমের ও দ্রব্যাদি প্রদানের দ্বারা মন্ত্রাদি পাঠ এবং ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনা এবং পদাবলী গানের এবং কীর্তন ও কথকতাদির অনুষ্ঠান হইবে সেই সমস্ত স্থান বুঝাইবে। এই সমস্ত স্থানে রবাহূত, অনাহূত ও আহূত সমুদয় স্ত্রী-পুরুষকে বুঝাইবে।"

৬। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (ঘ) ধারায় "সর্বসাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

৭। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (ঘ) ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে "স্থানে সর্বসাধারণকে ঢুকিতে দেওয়া হয় ও ঐরূপ" উঠিয়া যাইবে।

৮। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২(ঘ) ধারার ৪র্থ ছত্রে "উদ্দেশ্যে" কথাটির পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে : "বা ধর্মানুষ্ঠানের

জন্য বা বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মের এক পঙ্‌ক্তিভোজনের জন্য এক বা একাধিক জনকে আহার্য প্রদানের জন্য বা ভৃত্যশ্রেণী অথবা ভাগিদার, মাহিদার, গোপালক ও মজুরদের আহার্য দিবার জন্য"।

৯। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (ঘ) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে: "(ঘঘ) 'পঙ্‌ক্তিভোজন' বলিতে যে স্থানে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এক সারিতে বসিয়া আহারাদি করিবে এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বা অনুগত ভৃত্যাদির জন্য পৃথক খাদ্যপাত্র বা খাদ্যস্থান বা পৃথক আসনাদির ব্যবস্থা থাকিবে না তাহা বুঝাইবে।"

১০। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (চ) ধারায় "সাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

১১। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (চ) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে: "(চচ) সম্পত্তি উৎসর্গ বলিতে হিন্দুধর্ম-শ্রেণীভুক্ত যে কোন ব্যক্তি অথবা যে কোন সমিতি স্বীয় সম্পত্তিসমূহ উৎসর্গ করিবেন এবং করিয়াছেন তাহা বুঝাইবে এবং এই উদ্দেশ্যে পূজা, অর্চনা, ভোগ, অতিথিসেবা, যাত্রা, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ, সঙ্গীত ও নৃত্যাদির ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য যে সমস্ত সম্পত্তি, অর্থাদি উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং হইবে তাহার সমুদয় বুঝাইবে এবং দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক আয় সকল যথাযথ ব্যয় হইতেছে কি না এবং অবৈধভাবে দক্ষিণা, ভেট, দেবায়তনে প্রবেশমূল্য আদায় হইতেছে কি না তাহা সমুদয় বুঝাইবে।"

১২। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২ (চ) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে: "(চচচ) পূজারী ও অসম্মত ব্যক্তি বলিতে পুরোহিত, গুরু, আচার্য, গ্রহাচার্য, পণ্ডিত, যে কোন ব্যক্তি ধর্মবিষয়ক কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবিকা বা উপজীবিকা স্বরূপ এই ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত নাপিত, ধোপা, বাহক, বাদ্যকর, কথক

প্রতিদিন কার্য করিয়া থাকেন এবং জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ উপলক্ষে ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত হইয়া হিন্দুজাতির কোন কোন অংশে এইরূপ স্বীয় কার্য করিতে রাজী না হয় তাহাদিগকে অসম্মত বুঝায়।"

১৩। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ২(ঘ) ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসাইতে হইবে :—

"স্থানীয় রীতি ও প্রথানুযায়ী যে কোন দেবায়তনে এবং যে কোন স্থানে যে প্রকারে পূজা করা হউক না কেন, তাহা সমুদয় বুঝাইবে। এবং এই সমস্ত পূজা অর্চনা করিয়া যে সব গুরু, পুরোহিত, ঠাকুর, আচার্য, গ্রহাচার্য, পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের কার্যাদি করেন তাঁহাদের সকল বর্ণের সকল শ্রেণীর পূজকদের বুঝাইবে।"

১৪। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (⁄০) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে : "(⁄০ ⁄০) পর নাপিতদের চুলকাটা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে কাজ করা এবং গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রহাচার্য প্রভৃতি এবং ধোপা, বাহক. বাদ্যকর, দাই, কথক, কীর্তনগায়ক প্রভৃতি পেশাদারদের সকল শ্রেণীর হিন্দুদের আহ্বানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যথাযথ মূল্য লইয়া কাজ করিতে সম্মত করা অথবা"।

১৫। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (⁄০) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে : "(⁄০ ⁄০ ⁄০) পেশাদার পূজারী ও অসম্মত ব্যক্তির কার্য পাওয়া, অথবা"।

১৬। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (৶০) ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে : "(৶০ ৶০) উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করা বা দর্শকরূপে অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করা বা উৎসর্গীকৃত দেবতার সম্পত্তির সামাজিক অধিকার অর্জন করা, অথবা"।

১৭। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (।/০) ধারায় "সর্বসাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

১৮। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (।৵০) ধারায় "সাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

১৯। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৩ (খ) (॥০) ধারায় "সাধারণের" এই কথাটি উঠিয়া যাইবে।

৪ ধারা

২০। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ৪ ধারার চতুর্থ ছত্রে "সৃষ্টি করিবেন না" কথাগুলির পর "বা দুই ধারার (ঘ) প্রকরণের (১) সংখ্যায় লিখিত কোন কার্য করিবেন না" কথাগুলি বসিবে।

ভূমিকা

২১। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, ভূমিকার ২য় এবং ৩য় ছত্রে "দূর করিবার" কথাগুলির পর "এবং অসম্মত ব্যক্তিদের সম্মত করিবার নিমিত্ত" কথাগুলি বসিবে।

২২। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, "বর্ণ ও মতনির্বিশেষে সকল হিন্দুকে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ ও অধিকার অর্জন করিতে দেওয়াই প্রাদেশিক সরকারের নীতি" কথাগুলি ভূমিকার শেষে সংযোজিত হইবে।

২৩। শ্রীনিশাপতি মাঝি প্রস্তাব করিবেন যে, নিম্নলিখিত কথাগুলি ভূমিকার শেষে বসিবে : "এবং অসম্মত ব্যক্তিদের সম্মত করিয়া বর্ণ এবং মতনির্বিশেষে সকল হিন্দুকে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ ও সমান অধিকার অর্জন করিতে দেওয়াই:পশ্চিম-বঙ্গের সরকারের নীতি।"
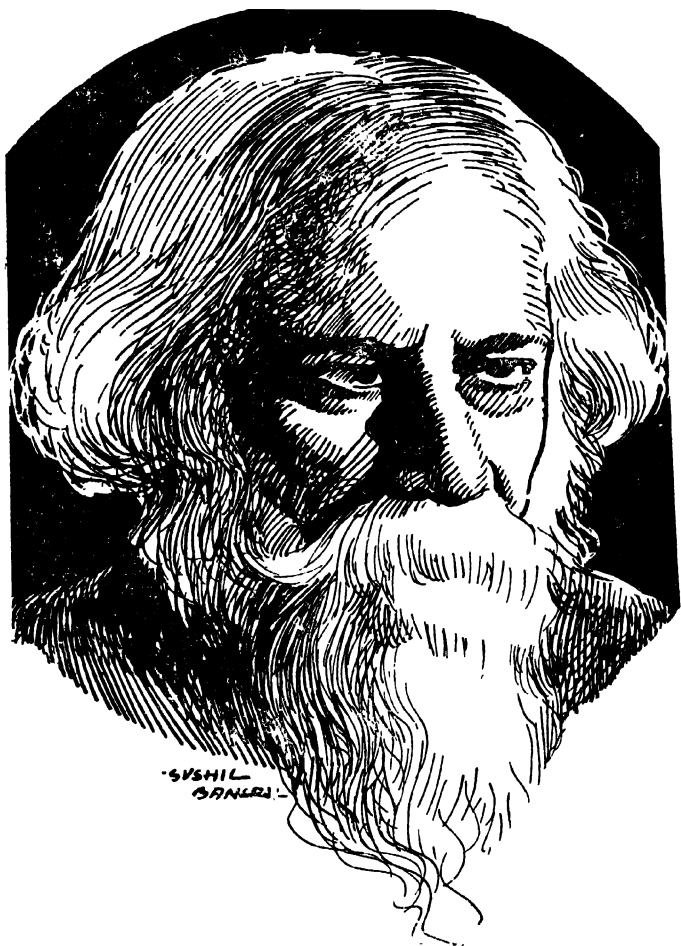
"জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দয়া ক'রে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ভারতে অস্পৃশ্য নামে যে কোটি কোটি মানুষ আছে, আমি নিজেকে তাদেরই একজন ব'লে দাবি করি।...আমার দেশের শাসনতন্ত্রের রেজিস্টারে বা সমাজের তালিকায় এই অস্পৃশ্য সমাজকে 'ভিন্ন শ্রেণী'-রূপে স্থান দিতে আমি চাই না। আজকের অস্পৃশ্যকে কি চিরকাল অস্পৃশ্য ক'রে রাখতে হবে? আমি বরং চাইব যে, হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্, কিন্তু অস্পৃশ্যতা যেন না থাকে।"

—মহাত্মা গান্ধী

পশ্চিম-বাংলার জনসংখ্যা

জিলার নাম	শহর	শহরের লোকসংখ্যা	গ্রাম	গ্রামের লোকসংখ্যা
কলিকাতা	—	২,১০৮,৮৯১	—	—
২৪ পরগণা	২৯	৮৭২,০৬১	৪,০৩৫	২,৭৯৭,৪২৯
নদীয়া	৬	১১৬,২৮৬	১,২২৮	৭৩৪,০১৭
মুর্শিদাবাদ	৭	১২০,৪৪৯	১,৮১৬	১,৫২০,০৮১
বর্ধমান	১০	২২৩,১৫৪	২,৮০৩	১,৬৬৭,৫৭৮
বীরভূম	৫	৬০,৩৩৪	২,[illegible]১১	৯৮৭,৯৭৩
বাঁকুড়া	৪	৯১,৯৭৬	৩,৫২২	১,১৯৭,৬৬৪
মেদিনীপুর	৯	১৮৮,০৪৭	১০,৭১১	৩,০০২,৬০০
হুগলী	১০	২৮২,৯০২	১,৯০৮	১,০৯৪,৮২৭
হাওড়া	২	৪২৯,৬৮৯	৮২৮	১,০৬০,৬১৫
পশ্চিম-দিনাজপুর	২	৬,৯৫২	২,৩৩৪	৫৭৪,৬৯২
জলপাইগুড়ি	১	২৭,৭৬৬	৮৮৯	৮১৭,৯৩৫
দার্জিলিং	৬	৫৮,১৬৪	৫৭৮	৩১৮,২০৫
মালদহ	২	২৭,১৭৯	১,৪১৫	৮১৭,১৩৬

কলিকাতার সংখ্যা ও বৃহৎ শহরগুলির জনসংখ্যা বর্তমানে শতকরা প্রায় ২০ কুড়ি জনের অধিক।

অধিক উৎপাদন

"ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—কবি বাংলা দেশকেই উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলেন। কিন্তু বাংলার সে দিন আর নেই। বাংলার অন্ন-ভাণ্ডার আজ শূন্য। অথচ অন্নই বাঙালীর প্রাণ। ভাগ্যের পরিহাস এমনি যে, বাঙালীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্ন নেই। অন্ন দাও, অন্ন দাও—ব'লে দুর্গত জনগণ ক্রন্দন করছে। অন্ন সংস্থানের জন্য অন্নদাসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খাদ্যের অভাব ও দুর্ভিক্ষের সুযোগে যাঁরা আজ অন্নদাতা হতে চান, তাঁরা তো নিজেরা কেউ অন্ন উৎপন্ন করেন না। শিশুর অন্নপ্রাশনের মতন তাঁরা অন্ন-উৎপন্নকারীর আহার অপহরণ করেন, অথচ তাঁরাই আবার অন্নসত্রের মালিক, উত্তরাধিকারী। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ধরনের নির্লজ্জ অন্নের মালিকেরা সৃষ্টি করেছিল। এজন্য পশ্চিম-বঙ্গ সরকার আজ সক্রিয়। তাই বর্তমানে পল্লীকে আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য সরকারী শক্তি বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছে। এ উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়, তবেই পশ্চিম-বাংলা রক্ষা পাবে।

পশ্চিম-বাংলার প্রায় ৩৫ হাজার পল্লীর শতকরা ৯০টি পরিবার গুরুতর অন্নসমস্যার সম্মুখীন। অপরদিকে শহর অঞ্চলে খাদ্য-বরাদ্দ এলাকায়, কলকারখানা, খনি এবং চা-বাগানে প্রায় ৮০ হাজার আবালবৃদ্ধবনিতাকে অন্নের জন্য প্রতিদিন গলবস্ত্র হয়ে দণ্ডায়মান হতে হচ্ছে। এরা সবাই শহরবাসী। শহরবাসী কোন দিন অন্ন উৎপন্ন করে নি। গ্রামবাসীই অন্ন উৎপন্ন করেন এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অন্নময় পল্লীগুলি এজন্য মধুময় হয়ে থাকত। পল্লীবাসী নবান্ন উৎসব ক'রে অন্নপূর্ণার অর্চনা করত। এখন নব অন্ন গ্রহণ করবার আর কোন বিধি-নিয়মের বালাই নেই। অন্নের নামে ব্রহ্মদেশ থেকে আগত এক প্রকার বাঙালীর অখাদ্য চাল আসছে। দেশের চালও পচা দুর্গন্ধ, কাঁকর-বালি মিশ্রিত। অন্ন দ্বারা

আউস ধানের জমিতে হৈমন্তিক ও চৈতালী ফসল উৎপন্ন

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকগণ ভাল আউস জমিতে জলসেচের সুযোগ পাইলে ধান তুলিয়া হৈমন্তিক চাষ করিতে প্রয়াসী হইত

গ্রামের শাক-সবজী চাষের ও অন্যান্য চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি
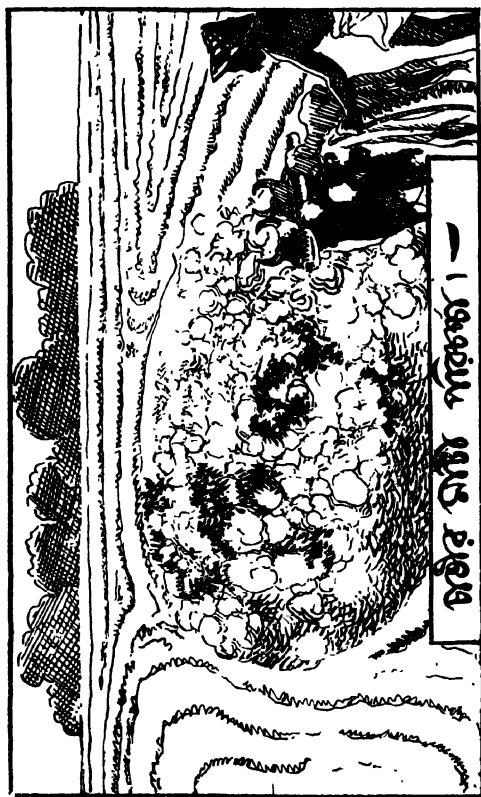
জমি হইতে আউস ধান তুলিয়া লইয়া, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকগণ এইভাবে হৈমন্তিক ফসল চাষের জন্য মাটির পরিচর্চা করিত

তাই বাঙালীর উদর পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে পল্লীবাসীও জমি-জায়গা, হাল-লাঙ্গল, সার, বীজ এবং ধর্ম-গোলার কাছে বিদায় গ্রহণ করেছে। চোরাকারবারের বহর এজন্য দিন দিন বেড়ে চলছে। তাঁতী এতদিন লাঙ্গল ও মাকু সমান ভাবে চালাত, সে আজ লাঙ্গল বাদ দিয়ে মাকু ধরেছে। ঠিক এমনিভাবেই কুমার, ছুতার, কাঁসারী, শাঁখারী, কলু, গোয়ালা, ময়রা প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পজীবী স্বীয় কর্মত্যাগ ক'রে চোরা-ব্যবসায়ী হয়ে পড়েছে। দেশের প্রকৃত চাষী মজুর, ভাগচাষী, রাখাল, মাহিনদার প্রভৃতি সুযোগ বুঝে রাস্তার কাজে ও মিলের কাজের দিকে ধাবিত হয়েছে।

তা হ'লে কী উপায়ে পশ্চিম-বাংলার সমস্যার সমাধান হবে? এই প্রদেশের প্রায় আড়াই কোটি লোকের অন্ন কোথায়? দামোদর এবং মসানজোর পরিকল্পনায় হয়তো এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে দেশের অবস্থা কী হবে? বৃষ্টির তারতম্য, মহামারী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সূচনা হ'লে এই প্রদেশের অন্ন-সমস্যা কি রকম তীব্র হবে, তা কি বড় কেউ চিন্তা করেন? পশ্চিম-বাংলা তো আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার ভিত্তি—কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কাজ, কিন্তু এই কাজে বড় বেশি কারো আগ্রহ দেখা যায় না। এই দেশের প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামে ১ কোটি ১৭ লক্ষ কৃষক। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকের গড়-সংখ্যা ৭৩ জন ছিল। ভাগচাষীর সংখ্যা দেখা যায়—১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। মোট জমি ১ কোটি ২০ লক্ষ একর। এর মাঝে আউস ধানের জমি ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, আমন ধানের জমি ৫৭ লক্ষ ১১ হাজার, শাকসব্জী চাষের জমি ৭ লক্ষ ৭২ হাজার, তৈল-বীজের জমি ১ লক্ষ ৭৭ হাজার, কলাই চাষের জমি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার, গম যব ইত্যাদি চাষের জমি ১ লক্ষ ৭১ হাজার, আলু চাষের জমি ৯১ হাজার

একর। এখানে এই যে চাষ জমি এবং ফসলের একটা হিসেব দেওয়া হ'ল—এর তৎপর উন্নতি বর্ধন করা স্বাধীন বাংলার কর্তব্য নয় কি ?

শত করা পাঁচভাগ জমিতে যদি বেশি ফসলের ধান ও ভাল শাকসব্জী উৎপন্ন হ'ত, তা হ'লে বিগত দশ বৎসরে এই প্রদেশের অন্নসমস্যার আংশিক প্রতিবিধান হতে পারত। তৈলবীজ কলাই গম কচু যব এবং আলু চাষের তথ্য সংগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে দেশের উৎপন্ন কার্য নানা সমস্যায় বাধাপ্রাপ্ত। এ রকম অবস্থায় তৎপরতার মাঝে কৃষিবিষয়ক গবেষণামূলক কর্মপন্থা স্থির করতে হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য সহজ সরল উপায়ে যে সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হতে পারে, সেই দিকটাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে জমির পরিচর্চার পর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আউস ধান চাষ হয়ে থাকে আশ্বিন-কার্তিক মাসে আউস ধান জমি থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই জমিতে তখন মাটি সিক্ত থাকে। সিক্ত মাটিকে উর্বর ক'রে সার দিয়ে কৃষক যদি এক একর জমিকে চার ভাগে ভাগ ক'রে গম, কলাই, আলু, কপি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি সব্জী চাষ করে, তা হ'লে এক একর জমিতে যত পরিমাণ মূল্যের ধান হয়, তত পরিমাণ মূল্য অন্যান্য ফসল ফলতে পারে। একে এক প্রকার মিশ্র চাষ বলা যেতে পারে। একদিন এইরূপ চাষ সবাই করত।

বর্তমানে এইরূপ মিশ্র চাষের বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত এবং তাদের ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়াও বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, মশানজোর ও দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত কৃষিকার্য শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক নানা আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জেলাবাসীর এই ইচ্ছাকে প্রবল ক'রে তুলবার জন্য এখানে এক এক জেলার কৃষকের, ভাগচাষীর ও জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি।—

প্রত্যেক কৃষক ও ভাগচাষীর এইরূপ কৃষিকাজ করা উচিত

সাধারণত তিন চার বিঘা জমিতে কৃষক কলাই, গম, আলু, কপি, টমেটো, পেয়াজ ও লতাজাতীয় শাক-সবজী চাষ করিতে অভ্যস্ত ছিল
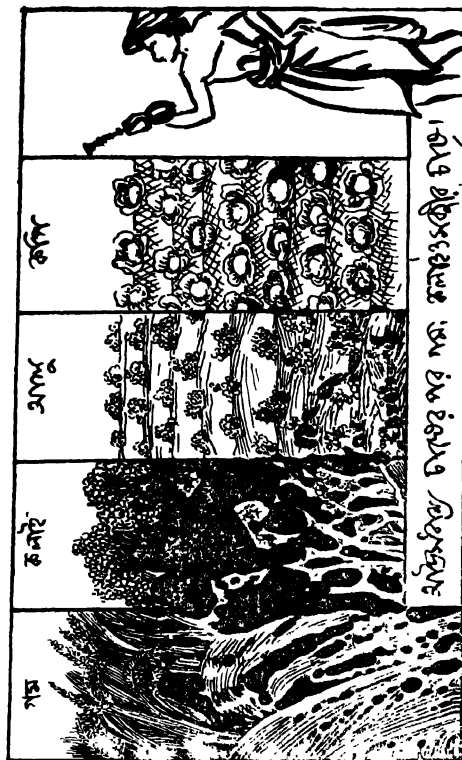
অন্নময় পল্লীতে মধুময় আবহাওয়ার দৃশ্য

গৃহলক্ষ্মী নবান্ন উৎসবে নিমগ্ন। গোলাভরা ধান, শাক-সবজী ও ফল-ফুলে গৃহের অপূর্ব শ্রী

এই বিবরণটি দেশবাসীর সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এজন্যই সর্বশেষে সুজলা সুফলা বাংলা দেশের গৃহলক্ষ্মীর একটি চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রকেই সম্মুখে রেখে বলেছিলেন—"বাংলার মাটি, বাংলার জল"। বাংলার মাটি এবং জলের যথার্থ সদ্ব্যবহার দ্বারাই আমরা আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারি। এজন্য আমরা শক্তিকে উৎসর্গ করব, নিজেকে একটি পল্লী-অঞ্চলে কৃষক ব'লে পরিচয় দেব। জানি না, এই মনোভাব কবে দেশে জাগ্রত হবে! আমার বিশ্বাস, যতদিন এই মনোভাব জাগ্রত না হবে, ততদিন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হবে না। 'ধনে ধান্যে, ফলে ফুলে' পল্লীর শ্রী ফুটে উঠবে না।

জেলাসমূহের কৃষকের ভাগচাষীর ও জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জেলা	কৃষকের সংখ্যা	ভাগচাষীর সংখ্যা	মোঃ জঃ (একর)
২৪ পরগণা	২০৮৯০০০	৩৯২০০০	১৬০২০০০
নদীয়া	৬১৯০০০	৪২০০০	৬৫৭০০০
মুর্শিদাবাদ	১১৩৯০০০	১২৪০০০	৯৪৮০০০
বর্ধমান	৯৯০০০	২৬৯০০০	১১৬০০০০
বাঁকুড়া	৭৬৮০০০	৫০০০০	১০১৪০০০
বীরভূম	৭১৭০০০	৯৩০০০	৭৯৮০০০
মেদিনীপুর	২৫২৭০০০	১৬৪০০০	২২৬৮০০০
হুগলী	৭২৯০০০	২০২০০০	৫৬৩০০০
হাওড়া	৫৮১৯০০	১৫৮০০০	২৪৯০০০
পশ্চিম দিনাজপুর	৫১২০০০	৭১০০০০	৭৩১০০০
জলপাইগুড়ি	২৭৫০০০	১০০০০০	৮৩১০০০
দার্জিলিং	১০০০০০	—	৫৪৬০০০
মালদহ	৬০৫০০০	১.৩০০০	৬৭১০০০
মোট	১১৭৫১০০০	১৭৭৭০০০	১২০৩৮০০০

(১৩৫৫ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত)

চাষী, ছুতার, কামার ও তাঁতী

আজও বস্ত্রের হাহাকার দূর করবার জন্য বাংলার হরিজন, কৃষক, তাঁতী, ছুতার ও কামার গভীরভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে নারাজ। আবার বুদ্ধিজীবীরাও শ্রমজীবীদের সহায়তা করতে পরাঙ্মুখ। এজন্য সামাজিক শ্রম্‌ ও বিশেষ শ্রমের অভাবে পল্লীসমাজের পুনর্গঠনের কাজ গ'ড়ে উঠছে না। সকলেই যেন অধিকতরভাবে সাধারণ পরিশ্রমের দ্বারাই বাড়তি আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু প্রকৃত বাড়তি আয় নিপুণ ও বিশেষ শ্রম ব্যতীত স্থায়ী হয় না। গ্রামের হরিজন, কৃষি ও শিল্পীদের এই কারণেই ব্যক্তিগত শ্রমকে অধিকতর উন্নতি করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কৃষকেরা যদি নিজের ইচ্ছামত কেবল খাদ্য-ফসল উৎপন্ন ক'রে চলেন, তা হ'লে শিল্পীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিশেষ শ্রমের অভাবে প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপন হবে না। কৃষকদেরও ভাবতে হবে, বাংলায় কেন বয়ন কাজের দ্বারা বস্ত্রের অভাব দূর হচ্ছে না? দুঃখের বিষয়, অখণ্ড বাংলায় ৬ কোটি বাঙালীর মধ্যে ৬ লক্ষ জনও চরকায় সুতা কাটতেন না। খাদি সঙ্ঘের শেষ রিপোর্ট (১৯৪০) দেখা যায়, ভারতবর্ষে ৭ লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩ হাজার ৪৫১টি গ্রাম খাদির কাজ করেছিল। তন্মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১১৬ জন খাদির কাজে চরকায় সুতা কেটেছেন। অখণ্ড বাংলায় ৮৫ হাজার গ্রামের একজন ক'রেও খাদির কাজ করেন নাই। এজন্য দায়ী শুধু্‌ শহর নয়, গ্রামও দায়ী। গ্রামের কৃষক তুলা চাষ ক'রে, গৃহী চরকায় সুতা কেটে, তাঁতি কাপড় বুনে দেশের বস্ত্রের অভাব মিটাবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। খাদিশিল্প ও পল্লীর অন্যান্য শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হওয়ায় পল্লীর শ্রী ও আনন্দ অন্তর্ধান করছে। গান্ধীজী গভীর দুঃখে এই

গঠনমূলক কর্মপন্থা নির্দেশকালে লিখেছিলেন—'বুদ্ধিহীন নিরানন্দ পল্লীবাসী তাদের অযত্নরক্ষিত গরুবাছুরের অবস্থায় প্রায় এসে পৌঁছেছে।'

বাংলার কৃষকগণ তথা হরিজনগণ সচেষ্ট হয়ে সূতা তৈরির জন্য কাঁচামাল, কাগজের ও বাঁশের কাজের জন্য নানা দ্রব্য চাষ করেন না। কাঠের কাজের জন্য নানা রকমের প্রয়োজনীয় গাছ বসাতে অভ্যস্থ নন। অন্যান্য শিল্পের জন্য নানা প্রকারের সুবিখ্যাত চাষ করতে এবং সমষ্টিগতভাবে বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারেন। আরও বহুবিধ শিল্পদ্রব্যের কাঁচা মাল নির্বাচন ক'রে কৃষকগণ শ্রমের মধ্য দিয়েই সমাজজীবনকে সজীব ক'রে তুলতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, এই যে বাংলার কৃষক নিজ নিজ জমিতে যদি আবশ্যকমত তূলা চাষ করেন, তা হ'লে গ্রামের ছুতার, কামার, চামার ও তাঁতীদের প্রাণ নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমানে অধিক পরিমাণে তূলা চাষ ক'রে কৃষকদের বাড়তি আয়ের কথা ভাবা দরকার। সরু সুতার কাপড় দিনে দিনে কমাতে হবে। তা ছাড়া তূলা চাষ করা বর্তমান দুর্দিনে চাষীর প্রধান কর্তব্য। বস্ত্র-সমস্যার দুর্নীতি দেশে বেড়ে চলছে। তার উপর যদি বিগত যুদ্ধের ন্যায় সকল জিনিসের দাম বাড়তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তা হ'লে কৃষকদের সর্বহারা হতে হবে। দুর্নীতি আরও বেড়ে উঠবে। ভাল মিহি সুতার তূলার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র—পাকিস্তানের উপর বর্তমানে নির্ভর করছে। সে দিক দিয়ে তূলা ও অন্যান্য ফসল চাষ কৃষকরা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বিশেষ নাই, বরং তাতে লাভই হবে বেশি। তা ছাড়া প্রত্যেক গৃহী যদি আশেপাশের জায়গায় 'গাছকাপাস' গাছের কয়েকটি চারা রোপণ করেন, তা হ'লে গ্রামগুলি সত্যই নির্ভরশীল হতে পারে। অকেজো জায়গায় বিনা যত্নেই গাছকাপাস বড় হয়ে উঠে। গৃহের লোক তার তূলা থেকে অনায়াসে বীজ

ছাড়াতে পারেন। একটা কেরকী নিয়ে বীজ ছাড়ানো ও ছোট ধনুক নিয়ে তূলা ধোনার কাজও চলতে পারে। ছোট তক্তার উপর সরু কাটি দিয়ে তূলা পাঁজ করা অসম্ভব কাজ নয়। এইভাবে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক গৃহী তূলা চাষ, তূলা আহরণ, বীজ ছাড়ানো, পরিষ্কার করা, ধোনা, পাঁজ-করা খুব অল্পদিনেই শিখে নিতে পারেন। দেখা গিয়েছে, এই কাজে কর্মী অপেক্ষা গৃহের ছেলেমেয়ে শিক্ষার্থীরাই বেশি আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কাজে কৃষকের কোন আগ্রহ নেই। কৃষকেরা অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কেহ কেহ বচন মুখস্থ ক'রে ব'লে থাকেন, খাদি প্রবর্তন হ'লে বাতাসের বিপরীত দিকে নৌকা চালানো হবে, গান্ধীজী বর্বর যুগে দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সুখের বিষয়, ১৯৪৪-৪৫ সালে দেশের কৃষকদের অনেকটা চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়েছে। গর্বের সঙ্গে অনেকে বলছেন—"সুতা কেটে মোটা কাপড়ের অভাব আর নেই। বস্ত্রের যতই দুর্ভিক্ষ হোক না, কোনরূপেই আর পরিবারের বস্ত্রের অভাব হবে না। এমন কি বিদেশী কাপড় অভাবের তাড়নায় স্পর্শও করব না।"

অনেক দিন আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সাধনা ও সেবার উদ্যোগের অভাব দেখে জাতিকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—"চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড় বিষয়ে তাদের অনুবর্তন করতে হবে —কোমর বেঁধে বলা চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হ'লেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব।—এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন ক'রে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।"

আজকে প্রকৃষ্ট সাধনায় শুধু শিক্ষিত ব্যক্তি ও কৃষকেরা নিমগ্ন হ'লেও

সিদ্ধিলাভ হবে না। দেশের ছুতারদেরও চরকা তৈরির জন্য নিপুণ কারিকর হতে হবে। পূর্বে তৈরি চরকা বিভিন্ন সঙ্ঘ সরবরাহ করতেন। বর্তমানে চাহিদা অনুপাতে তার সরবরাহ হচ্ছে না। গ্রামের ছুতার চরকা তৈরি করতে সহজে রাজী হয় না। বেশি আয়ের আশায় ছুটাছুটি করছে। অথবা নিপুণ পরিশ্রমের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে "কাঠ নাই" "সামর্থ্য নাই" প্রভৃতি অজুহাত দেখিয়ে চরকা তৈরিতে ইস্তফা দিচ্ছে। অথচ খাদি প্রতিষ্ঠানের নির্মিত একটা চরকা দেখেই গ্রামের ছুতার চরকা প্রস্তুত ক'রে দিতে পারেন। চরকা তৈরি হতে পারে এমন গাছ আজও গ্রাম থেকে নির্মূল হয়ে যায় নি। ধনুক তকলি তৈরি করা আরও সহজ। কিন্তু ছুতারের ক্ষতির আশঙ্কা কোন প্রকারেই দূর হচ্ছে না। এজন্য পূর্বেই বলেছি, চাষীর দরদ শিল্পীর প্রতি নাই—শিল্পীরও দরদ চাষীর প্রতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পল্লী সংগঠনের দ্বারা সর্বাগ্রে তাই পারস্পরিক শ্রমের যোগসূত্রের বন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে। নতুবা চাষীর সঙ্গে ছুতার, ছুতারের সঙ্গে কামার, কামারের সঙ্গে তাঁতী সহজে একত্র কাজ করতে পারবে না। এইরূপ একতাবদ্ধ কাজে ছুতার কামার তাঁতী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করাই বাংলার বর্তমান সমস্যা-সমাধানের একটি বিশেষ কাজ।

গান্ধীজী দেশবাসীকে অবসর সময়টুকু অর্থাৎ প্রতিদিন এক ঘণ্টা চরকায় সুতা কাটবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের চাষীর ও ছুতারের ন্যায়ই কামারের বিরোধী মনোবৃত্তি তীব্র হয়ে উঠেছে। কামার লোহা ও ইস্পাতের নানা অজুহাত দেখিয়ে কুলগত বৃত্তিকে বিনাবাক্যে ত্যাগ করছে। কামারের কাজ শুধু খাদির সহায়ক নয়—কৃষকের ও ছুতারেরা যন্ত্রপাতি কামারই গ'ড়ে দেয়। কামার না থাকলে এঁদের হাত অচল হয়ে থাকত। হয়তো চালানী

যন্ত্রপাতিতে অনেকটা অভাব দূর হয়েছে, কিন্তু আজও কৃষিযন্ত্র ও শিল্পীর হাতিয়ার মেরামতির জন্যও কামারের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এখনও গ্রামের শত-করা ৯৫জন লোক গ্রামের কামারের তৈরি জিনিসই ব্যবহার করেন। লোহা পিতল কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর বহুবিধ জিনিস গ্রামের লোক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রয় করে। এতে শুধু টাকা-পয়সার দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় হয় না, শিল্পী নূতন কিছু তৈরি ক'রে গ্রামবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা লাভ ক'রে থাকেন। কোন কোন গ্রামে ছুতারেরা তাঁত ও চরকা তৈরি ক'রে লোহার ও ইস্পাতের দ্রব্যগুলি আজকাল কামারদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। যদি আবার পল্লীবাসী পূর্বেকার মত লাঙল-প্রতি উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ ছুতার ও কামারকে প্রদান করে, তা হ'লে অতি সহজেই গ্রামের শ্রী ফিরে আসতে পারে। তাতে আবার গ্রামে গ্রামে ছুতারপল্লী ও কামারপল্লীতে কর্মের কোলাহল জেগে উঠবে। এমন কি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগুলিও রাক্ষসের ন্যায় এই সব শিল্পীদের সহজে গ্রাস করতে পারবে না। ভবিষ্যতে এদের দ্বারাই পল্লীর গৃহস্থালীর রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। পল্লীমুখী জাতি গ্রামের জিনিস গ্রামে সংগ্রহ করতে পারলে সহজে কলের তৈরি জিনিস গ্রহণ করবে না। জাতির রুচি যখন স্বদেশী হয়ে উঠছে এবং নূতনভাবে দেশকে গ'ড়ে তোলবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোভাব জেগে উঠছে, তখন কামাররা যে নিজের জিনিস গ্রহণ করবে না— এ কথা বলা অন্যায়। কামাররাও এ কাজে ধীরে ধীরে নিযুক্ত হচ্ছে।

বাংলার দারিদ্র্য অনাহার এবং আলস্যই সব কাজের প্রধান বাধা। এজন্য শহরের সঙ্গে গ্রামের এবং গ্রামের সঙ্গে চাষী ছুতার কামার ও তাঁতীর যোগসূত্র নাই। গ্রামের টাকাপয়সা গ্রামের বাইরে চ'লে যাচ্ছে। গ্রামের তাঁতীও পূর্বেকার মত এখনও জীবনযাপন করতে চান

না। এঁরা রাতারাতি টাকাওয়ালা হবার নানা রকমের কৌশল করতে শিখছেন। গ্রামের সাধারণ তাঁতী মিলের সুতা সংগ্রহ ক'রে আশাতীত মজুরির জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। ফলে চরকায় কাটা সুতার নানা প্রকার দোষ ব্যাখ্যা ক'রে তাঁতী চরকার প্রতি জাতীয় দরদকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। কোন কোন তাঁতী নিপুণভাবে খদ্দর বয়ন শিক্ষা না ক'রেই চরকা-কাটা সুতার ক্ষতি সাধন করছে। জগৎব্যাপী এই পরিস্থিতির সৃষ্টি অবশ্য বর্তমানে হয়েছে। আজ তাই খুব ভালভাবে সব দেশই বিশেষ সতর্ক হয়ে সরল বিনিময় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করছেন। মূলধন দ্বারা অতিরিক্ত আয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে কেউ আর কোন পরিকল্পনাকে খাড়া করছেন না ; শিল্পীদের অধিক আয়ের পথ সুগম ক'রে দিয়েই শ্রম-বিভাগকে উন্নত ক'রে তুলছেন। এইরূপ উন্নত ব্যবস্থার দ্বারা শুধু পল্লী-শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হবে না—গ্রামের মৃত প্রাণও সজীব হয়ে উঠবে। গ্রামের লোক শিল্পীদের উপর নির্ভর করবেন—শিল্পীরাও গ্রামবাসীদের আপন ক'রে তুলবেন।

তাঁতীর কাজ সুতায় মাড় দেওয়া, সুতা রঙ করা, টানা ও পড়েন তৈরি করা, ধোলাই করা এবং কাপড় বোনা। এখানে প্রশ্ন এই, কাপড়ের মালিক ও বিক্রেতা কে ? কাটুনীই কাপড়ের মালিক। অতএব কাটুনীরা এক জোড়া কাপড়ের যখন মজুরি দিবেন, তখন গড়পড়তা হিসাব নিখুঁতভাবে করতে হবে। যেন তাঁতী কোনক্রমেই অন্নবস্ত্রে এবং স্বাস্থ্যে ও শিক্ষায় বঞ্চিত না হয়। তা ছাড়া তাঁত চালানোর দ্বারা যে ক্রমশ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তার খরচ, তাঁতের জায়গাকে উপযুক্ত রাখার খরচও তলিয়ে বুঝে হিসাব করতে হবে। এই সব খরচের হিসাব বার করা খুব কঠিন নয়। মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারাই বাস্তব হিসাব ও ছুতার-কামারের সুখ-দুঃখের খতিয়ান তাঁতীর

কাছে লাভ করা যায়। যথা—(১) কতগুলি কাপড় তৈরির পর ছুতারের তাঁত অকেজো হয়? (২) মেরামতী খরচ বাবদ বছরে গড়ে কত ব্যয় হয়? (৩) তাঁতের ঘরটি কত বছর পর পর মেরামতি করতে হয়? ঘর তৈরিতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে? (৪) প্রতিদিন কত সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের জন্য অতিবাহিত হয়? স্বাস্থ্যরক্ষার খরচ, শিক্ষা বিষয়ে খরচ, খাওয়া-দাওয়ার খরচ ইত্যাদি তথ্য এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা সংগৃহীত হতে পারে।

যন্ত্রযুগের বহু পূর্বেকার বাংলার বিগত দিনের কথা আজ হয়তো অনেকে সময়ে সময়ে স্মরণ করছেন। সেদিন বাংলা স্বহস্তে সকলকে অন্নবস্ত্র পরিবেশন করত। বাংলার স্বাস্থ্য ছিল, শিক্ষা ও শিল্প ছিল, আনন্দ ছিল। বাংলার হাট ও মাঠ ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। বাঙালী নির্লজ্জভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে হুটোপুটি ও হানাহানি করত না। বাড়তি আয়ের জন্য অন্ধ হয়ে বাংলার ছুতার কামার ও তাঁতী নির্বিচারে কুশ্রী লোলুপতায় নিজের ধ্বংসস্তূপ নিজে রচনা করত না। গ্রামের সকলেই শিল্পকে শ্রীর বাহন ব'লে স্বীকার করতেন। আজও দেখা যায়, যে কাজে শ্রী নাই, সে কাজ মনকে স্ফূর্তি দেয় না। তার কারণ মনের স্ফূর্তির জন্য নিত্য নূতন সমাজে যে অভাব দেখা দিয়েছে, শিল্পী তার সমাধানে তৎপর। তার বিনিময়ে শিল্পীর অন্নবস্ত্রের জন্য নানা নিয়ম পল্লীতে বিনা বাধায় প্রতিপালিত হয়েছে। ধর্মব্যবস্থায়ও ছুতার কামার ও তাঁতীদের একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানা উৎসবে লোহার, কাঠের ও তাঁতের সাজনি আজও সর্বাগ্রে আবশ্যক হয়। গরীবের স্ত্রীও বিবাহ উপলক্ষে একখানা শাড়ী পেয়ে থাকেন। এসব বিধিব্যবস্থা নিয়মাদি কি বাংলা দেশে নিখুঁত পরিকল্পনা ব্যতীত হয়েছিল? উৎপাদিত দ্রব্যের প্রচারকার্য ও গৃহে গৃহে শিল্পের

বিকাশলাভও বোধ হয় সহজে হয় নাই। নিশ্চয়ই এই সব কাজের মধ্যে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যমন্ত্র প্রচারিত হয়েছিল। আবার জাতির মনোভাবকে জাগ্রত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বুদ্ধিকে ও পরিশ্রমকে তাই অনেকেই সহায় ক'রে তুলেছেন। রুচির আমূল পরিবর্তনও হচ্ছে। আরও কৃষি ও শিল্পীদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠুক—প্রত্যেক গ্রামবাসী গর্বের সঙ্গে অনুভব করুক, আমরা এক এবং অভিন্ন। ছুতার, কামার, তাঁতীও বুঝুক—আমরা গ্রামের গ্রাম আমাদের। হরিজনরা চরকা কেটে বস্ত্রের স্থায়ী সমাধান করতে পারে। সমাজের পাপ এই কাজের দ্বারা দূরীভূত করা খুবই সহজ। হরিজনদের শক্তি এ কাজে নিযুক্ত হ'লে খাদি সত্যই প্রাণবন্ত হবে। বর্তমানে দেখা যায় কতিপয় লোক খদ্দর পরিধান করে থাকেন। আপামর জনসাধারণ খদ্দর পরিধান ক'রে দেশের পল্লীকে সজীব ক'রে তুললে সত্যই দেশের চাষী, ছুতার, কামার ও তাঁতী এবং হরিজনরা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

পশ্চিম-বাংলার খনি ও কলকারখানার হিসাব

নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
চাউল	৩৮৮	কাগজ	১৪
ময়দা	১৬	দেশলাই	৬
তৈল	৪৩	কাপড়	৩১
চিনি	৪	পাট	৮৭
চামড়া	১০	লৌহাদি	১৮
কাঁচ	২৮	বিবিধ	৩৪৭

মেয়েদের কাজ

"আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড-পতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি"—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া রবীন্দ্রনাথের যখন এই বাণীটি আমরা স্মরণ করি, তখন চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসকল এই মহাসমরে ভিন্ন ভিন্নরূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবার জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা লইয়া কর্মব্যস্ত হইয়াছে, আর হতভাগ্য আমরা পঙ্গু হইয়া তিলে তিলে মরিতেছি। কুললক্ষ্মীরা যে গৃহকে মন্দিরের ন্যায় শ্রীভবন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড-পতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ সেই সব হরিজনদের গৃহগুলি ভগ্ন মাটির স্তূপে পরিণত হইতেছে। শাসন-সংযত কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে মরণের পূর্বে হরিজনদের দেশের মাটির জন্য আর্তনাদ করিবারও অধিকার নাই। ইতিপূর্বে এইরূপ ঘোরতর দুর্দিন ভারতে কোনদিন উপস্থিত হয় নাই। আমরা দায়ে বিপদে রাজায় রাজায় যুদ্ধে ও বিদ্রোহে অসহায়তার কথা নানাভাবে আলোচনা করিতে পাইয়াছি। এমন কি সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মে অধিকারও পাইয়া সত্বর জীবন রক্ষা করিতে পাইয়াছি। কিন্তু আজ আমরা ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে অবস্থান করিতেছি। জীবনমরণ সমস্যা যদি দিনে দিনে সঙ্কটপূর্ণ না হইত হয়তো নীরবে পাথরের মত সব-কিছু অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যক্ষ করা যাইত। আজ সে পথ অবলম্বন করিলে আমাদের পারিবারিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। জগতে ঘৃণ্য জাতির ন্যায় নারীর শক্তি ও রূপ-লাবণ্য ভাড়ায় বিক্রি করিবার মতই কুপ্রবৃত্তি গজাইয়া উঠিতে বাধ্য হইবে। তাই আজ হরিজন মেয়েদের

কৃষি শিল্প ব্যবসা ও শিক্ষায় উন্নতির কাজে বাহাল হইবার জন্য কাতর নিবেদন জানাইতে হইয়াছে। তাঁহারা যদি নোংরা অস্বাস্থ্যকর গৃহকে স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পল্লীতে পল্লীতে শিল্পভবন স্থাপিত হইবে। গৃহ ও পল্লীগুলিই শিক্ষা-মন্দিররূপে গড়িয়া উঠিবে। দেশের খাল, বিল, নালা, নদ-নদীর জল যেমন সাগরে পরিণত হয়, সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ কৃষিশিল্প সবের ও কলকারখানার সহিত পল্লীর একটা বাস্তব সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে। এমন কি ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত পল্লীগুলিতেও মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ কেবলমাত্র স্নেহের দ্বারাই আত্মরক্ষা করিবে না, তাহারা মুখে অন্ন, পরিধানে বস্ত্র পাইবে। আজ পল্লীতে গরীবের ঘরের মেয়েরা সন্তানদের স্নেহ দিয়াই কেবলমাত্র সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন। পথ্যের, শিক্ষার এবং প্রতিপালনের অন্যান্য ব্যবস্থায় অক্ষম হইয়া মাতাগণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছেন। এমত অবস্থায় দেশের স্বার্থবাদীরা যাহাই মনে করুন না কেন, এ যুগের সভ্যতা নূতনতর উপাদানে কোন দিন যে আবার পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইবে তাহার কোনই সূচনা আজও কেহ কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। এমন কি পল্লীতে পল্লীতে যন্ত্রযানের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য পল্লীবাসীর চিন্তাধারার কোন দ্রুত পরিবর্তনের উদ্যোগ-আয়োজনও কেহ অনুভব করিতে সক্ষম হইতেছে না। কাজেই আমাদের হয়তো আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ নিঃসহায় অবস্থাতেই করিতে হইবে, আত্মচেতনার দ্বারা আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে আর্থিক স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য মৃত্যুকে পণ করিয়া কাজে লিপ্ত হই, তাহা হইলেই আমাদের পারিপার্শ্বিক দুরবস্থা দূরীভূত হইবে।

পল্লীতে আজ গঠনমূলক ভাল আবহাওয়া শক্তির অভাবেই সৃজন

হইতেছে না। বিশেষ করিয়া পল্লীর মেয়েরা গৃহের, পল্লীর ও সমাজের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন বলিয়া দেশের গুরুতর সর্বনাশ হইতেছে। ভ্রান্তমতি পুরুষরা মেয়েদের খাদ্যবস্ত্রদানে অক্ষম, অথচ তাহাদের হাতের কাজ করিয়া দুপয়সা উপায়ের জন্য নূতনভাবে শিক্ষার আয়োজন করিতেছেন না। তাঁহারা সন্তানপালন এবং গৃহের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নামে মেয়েদের হালের গরু-বলদের ন্যায়ই প্রতিপালনের কামনা করেন। এই জন্য মেয়েদের দুঃখে বুক ফাটিতেছে, তবু মুখ খুলিয়া কোন কথা বলিয়া পরিবারের তথা পল্লীর আর্থিক উন্নতির কাজ করিতে পারিতেছে না। ক্ষুধার তীব্র আঘাতে এইজন্য বাংলার পল্লীর অন্তরজগতে যে দাবানল জ্বলিতেছে, তাহাতে 'মানুষের সৃষ্ট' দুর্ভিক্ষের কেবলমাত্র প্রতিবিধানের পাঁয়তারাই চলিতেছে—আভিজাত্য এবং সেকালের ভাবধারায় ধনিকের আসন আরও সুদৃঢ় হইতেছে। আমাদের দেশের তাঁতি, কুমার ও ডোমের মেয়েরা পুরুষদের যেমন সাহায্য করিত সেইরূপ কৃষকের মেয়েরা কৃষিকাজে সাহায্য করিতে অভ্যস্ত। সাংসারিক নানা কাজ করিয়াও সকলেই গাভী পালন, ঘৃত তৈরি, সার প্রস্তুত প্রভৃতিও করিতে পারে। ইহার দ্বারা সংসারের যৎসামান্য আয় বৃদ্ধি হয়। কোন কোন পরিবারের মেয়েরা শাক-সব্জী ফল-মূল চাষ করিয়াও তরিতরকারির অভাব মোচন করেন। পুরাতন জামা কাপড় হইতে কাঁথা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অভাব দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ঢেঁকি, জাঁতা, চরকা প্রভৃতি চালাইয়া সংসারের কিরূপ কল্যাণ সাধন করিতেন, তাহা আজ কল্পনার বিষয় হইয়াছে। আমাদের এই সব কাজের প্রতি এখন অরুচি দেখা দিয়াছে। ফলে 'বনস্পতি' দ্বারা আমাদের ঘৃতের অভাব মোচন হইতেছে। শুষ্ক তরিতরকারি খাইয়া দেহগুলিও শুষ্কতর হইতেছে। অর্থের অনটনে কুললক্ষ্মীদের বস্ত্রের

অভাবও দারুণভাবে দেখা দিয়াছে। কোন কিছু শিক্ষাদান কাজ সার্থক হইতেছে না। কাটছাঁটের কাজ, বাতিকের কাজ, চামড়ার কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার কোন প্রয়োজনবোধ পল্লীর মাতব্বরদের নাই বলিলেই চলে; সব-কিছু গোঁড়ামির জন্য বিফল হইতেছে। মেয়েদের বারো বৎসর বয়স হইলেই ঘরের ভিতর থাকিতে হইবে। ইহাদের হাতের কাজ শিখিয়া অন্ন সংস্থানের উপায় লাভ করিবার কোন অধিকার নাই বলিলেই চলে।

পল্লীতে পল্লীতে যদি দশটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া দশটি ভাল গাভীর মূলধন, দশটি ঢেঁকি, দশটি জাঁতা, দশটি নানা পশু পক্ষী পালনের জন্য ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে দেশবাসীকে সরকারী লোকের নিকট প্রার্থনা করিতে কথায় কথায় দ্বারস্থ হইতে হয় না। আজ বিদেশ হইতে গম, শাক-সব্জী এবং ঘৃত মাখম আসিতেছে বলিয়া দেশের সুখী পরিবার সকল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেছেন। যাঁহারা হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আলিগড় হইতে মাখম আনাইয়া টেবিলে বসিয়া রুটি বা মাংস গলাধঃকরণ করিতেছেন, তাঁহাদের গরীব পল্লীবাসীর এই সব দুঃখের কথা শুনিয়া অথবা দেখিয়া অন্তর কাঁপিবে না। তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্বক বাংলার বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে এবং শিল্পভূমিতে অধিক দ্রব্য উৎপন্নের জন্য শক্তিকে ও স্বার্থকে যৎসামান্য ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে বাঙালী কৃষককে আজকাল আলুর বীজের জন্য ক্ষেপা কুকুরের মত আর্তনাদ করিতে হইত না। ভিক্ষা অপেক্ষা নিজেদের দাবীর জোরে আলু, তুলা ও গম প্রভৃতি উৎপন্ন কার্যে সরকার সাহায্য করিতে বাধ্য হইত। সেইরূপ পল্লীতে পল্লীতে সামান্য ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা মূলধন সমবায় সমিতির দ্বারা সংগ্রহ করিয়া গো-পালন, সার প্রস্তুত ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। হাঁস, মুরগী, মৌমাছি

পালন এবং মধু, ডিম প্রভৃতি বিক্রয়ের যথাবিহিত আয়োজন করিয়া দিতে সক্ষম হইতেন। গ্রামে গ্রামে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি, হাপর, কুমারের চাক বসাইয়া সমবায় সমিতি পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেও পারিতেন। পুরাতন কাপড়, সুতা প্রভৃতি দিয়া কাঁথা জামা প্রভৃতি প্রস্তুত করা অসম্ভব হইত না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী প্রেরণ করিয়া হাতের নানা কাজ, বিশেষ করিয়া চামড়ার, বাতিকের, সেলাইয়ের কাজও গ্রামে গ্রামে প্রসারলাভ করিত।

অশ্রদ্ধা এবং উদাসীনতার জন্য সমবায় কার্যে ব্যক্তিগত কারখানা স্থাপন ও বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এই সব কাজের শিরদাঁড়ায় কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। গরীব পল্লীবাসী এইজন্য যে গ্রামকে কৃষি-শিল্পের মন্দির করিয়াছিল, তাহা ভগ্ন মন্দিরে পরিণত হইতেছে। অবশ্য বর্তমানে স্থানে স্থানে চুনকাম ও জোড়াতালি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু গরীব পল্লীবাসীর তদ্দ্বারা আর্থিক বৈষম্য ও বণ্টন ব্যবস্থার ঘোরতর তারতম্য দূরীভূত হইবে না। স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়া গরীব পল্লীবাসীকে তথা ছেলে, মেয়ে ও পুরুষদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গৃহকে মন্দিরের ন্যায় রক্ষার জন্য মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার লাভে উদ্যোগী হইতে হইয়াছে। মেয়েদের শক্তি ব্যতীত গৃহের শ্রী তথা পল্লীর কৃষিক্ষেত্র, শিল্পকাজ, সব্জীবাগান, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক গলদ দূরীকরণ হওয়া অসম্ভব। এতদিন যাবৎ বাঙালী শক্তিরূপিণী নারীকে কর্মবিমুখ করিয়া গৃহমন্দিরকে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়াছেন। এই কারণে শিশুপালন, প্রসূতিপরিচর্যা এবং নারীকল্যাণের কোন কাজ সফল হয় নাই। বাল্যবিবাহ ও বিধবা সমস্যার সমাধান মন্থর গতি লাভ করিয়াছে। সরদা আইন অচল অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। সরকার পক্ষ সনাতনী অর্থ-

পতিদের ভয়ে জড়সড় হইয়া শাস্তকর সরদার আইনকে যেন-তেন প্রকারে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অথচ খাদ্যদ্রব্যের চিরস্থায়ী হাহাকারের মধ্যে অর্থপতিদের রাজসম্মান ও ঐশ্বর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পল্লীবাসী নীরবে ধ্বংস হইয়াছে। ইহাতে কাহারও কল্যাণ হইবে না। পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে এক-একটি সমিতি করিয়া হরিজন মেয়েদের আশ্রয় দিতে হইবে। এইরূপ শিল্প-উন্নয়ন-সমিতি এক এক পল্লীর এক-একটি শিল্পকাজের প্রসার বৃদ্ধি করিবেন এবং দুর্গতদের হাতের কাজ দিয়া অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন। অপর দিকে যে কোন শিল্পদ্রব্যের গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের সম্পদবৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এই যে, বাংলা দেশের বাবলাগাছের ফল গাভীর উপাদেয় খাদ্য। গাভী বাবলার ফল খাইয়া বেশি দুধ দেয়। যে সকল গাভীর দুধ শুকাইয়া যায় তাহাদের বাবলার কাঁচা ফল খাওয়ানো উচিত। বাবলার ছাল হইতে কালি ও ঔষধ তৈয়ারি হয়; আটা হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়; চামড়ার কষ হয়; বাবলা কাঠে কৃষকের লাঙল তৈয়ারি হয়; কামার বাবলার লাঙলে ফাল বসাইতে খুব আনন্দ লাভ করে। সেইরূপ গাছ-গাছড়া হইতে ভাল টোটকা ঔষধ পাওয়া যায়। মায়েরা এই সব ঔষধ সংগ্রহ করিয়া কম খরচে চিকিৎসা করাইতেন।

আজকাল যেরূপ ভানের বহর ও পরিকল্পনার মনোরম ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে শিল্পদ্রব্যসংক্রান্ত এই প্রবন্ধ অনেকের মনঃপূত হইবে না। ঘাস পাতা লতা গাছগাছড়া এবং বাবলার কাঁটার কথা শুনিলে চায়ের টেবিলের সম্মুখ জমিয়া উঠিবে। এই জন্য বার বার গুরুদেবের একটি কথা কেবল স্মরণ হইতেছে—

"পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্য সত্য করি—ভান না করি।"

অস্পৃশ্যদের প্রতি বর্ণহিন্দুর পবিত্র কর্তব্য

"বর্ণহিন্দুকে, শুধু নামে নয়, কাজেও একজন ভাঙ্গি হইতে হইবে। যেদিন ইহা সত্য হইয়া উঠিবে, সেদিন অস্পৃশ্যতার চিহ্নমাত্র থাকিবে না এবং হিন্দুধর্ম জগৎকে এক অমূল্য সম্পদ দান করিয়া যাইবে, সেদিন গৃহ সাফ করার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ এক রূপান্তর ঘটিবে। ইংলণ্ডের প্রকৃত ভাঙ্গি হইতেছে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ। ভারতীয় সমাজ যতদিন না এইরূপে সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠে, ততদিন আমরা এইরূপ কোন পরিবর্তন আশা করিতে পারি না।"

—মহাত্মা গান্ধী

হরিজনদের হাতের কাজ

যুদ্ধ-জনিত অবস্থায় পল্লীর কোন কোন গরীব শিল্পীর হাতের কাজের দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এ দুর্দিনে পল্লীর গরীব কলু স্বীয় শক্তিকে সর্বজনীন স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে আংশিক সহায়তা করতেও অক্ষম। কেন না সরিষার অভাবে তাদের ঘানিতে যথেষ্ট তৈল তৈরি হচ্ছে না। কাগজীরা এইরূপ দেশের বিদ্যা বিস্তারের জন্য আংশিক সহায়তা করতে পারত, কিন্তু তাদেরও দ্রব্যাদির অভাবে প্রায়ই হাত গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে। কামারেরাও হাতুড়ি তুলে রেখেছে, তাদের চড়া দামে লোহা কিনে ফাল, কোদাল প্রভৃতি তৈরি করবার সামর্থ্য নেই। কোটালরা রাতে ঢেঁকিতে চিঁড়া তৈরি করত, কিন্তু কেরোসিনের আলোর অভাবে পল্লীর আবশ্যক চিঁড়া তৈরি করতে পারছে না। চামারের চামড়া তৈরির মালমসলারও অভাব দেখা দিয়েছে। দেশী মুচিরা চালানী চামড়ার দর বেশি বুঝে পাদুকা তৈরি ছেড়েই দিয়েছে। অনেকে বিদেশী কোম্পানির চামার হয়েছে। অথচ এই বাংলাদেশের মুচিরাই এক দিন সৈনিকের পায়ের জুতা, ঘোড়ার সাজ ও রণবাদ্যের নানা দ্রব্য তৈরি ক'রে দিয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। ডোমদের বাঁশ ও তালবেত দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। তথাপি ডোমেরা মোড়া চেয়ার টুকরি ও টুপি তৈরি ক'রে দু'পয়সা উপায় করছে। শুনা যায়, বাংলাদেশে লোহারগণ লোহা গালাই করত। কিন্তু বর্তমানে এরা স্বীয় জাত-ব্যবসার কাছে বিদায় গ্রহণ ক'রে কৃষিকার্যের মজুরি খাটছে। বাংলার হাড়ী বাগদী প্রভৃতি জাতির দ্বারা তাল ও খেজুর গুড় তৈরি হয়। বর্তমান বাংলার কোন কোন স্থানে মাদক দ্রব্যের চাহিদা এত

বৃদ্ধি হয়েছে যে, তাল-খেজুরের রস থেকে আর গুড় তৈরি হচ্ছে না, তাড়িই তৈরি হচ্ছে। বর্ধমান ও বীরভূমের মুসলমানগণ খেজুরের মাহাল তৈরি ক'রে গুড উৎপন্ন করে। কিন্তু তারাও মাদক দ্রব্যে অনুরক্ত হয়ে গোপনে তাল খেজুর রস থেকে তাড়ি তৈরি করছে। সব চেয়ে গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের পল্লীর অসহায়দের প্রধান অবলম্বন যে ঢেঁকি-শিল্পটি যেন-তেন-প্রকারে টিঁকে ছিল—এই ঢেঁকিগুলি সরকারী এজেন্টদের অর্থলোলুপতার জন্য আপাতত অচল হয়ে পড়েছে। কলের তৈরি চাল বাড়তি অঞ্চলের এজেন্টরা ঢেঁকি-ছাঁটা চালের প্রায় সমান মূল্যে ক্রয় করছেন। ফলে পল্লীতে অসহায়দের খুদ-ভাতের সংস্থানের উপায় নষ্ট হয়েছে। এমন কি গরুর খাদ্য কুঁড়া তুস খুদ প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। মোট কথা, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশে বর্তমানে পল্লীর গরীব শিল্পীদের যাবতীয় আয়োজনই বিগড়ে গিয়েছে। পল্লীবাসী যদি এর আশু প্রতিবিধানের জন্য যত্নবান না হন, তা হ'লে অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। অবশ্য পল্লীর আত্মরক্ষা এবং খাদ্য-সমস্যা, আরও বহুবিধ প্রধান সমস্যা উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কৃষি ও শিল্প সমস্যাই সবচেয়ে গুরুতর হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির কথাও বাদ দেওয়া যায় না।

আজ তাই কেবলমাত্র গরীব হরিজন শিল্পীদের এই দুরবস্থা থেকে কি প্রকারে রক্ষা করা যায় সেই বিষয় আলোচনা করছি। সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন বাইরের, কোন সাহায্য গ্রহণ না ক'রেই পল্লীর ছোট ছোট শিল্পগুলিকে এই দুর্দিনে খুব সহজেই গ'ড়ে তুলতে পারা যায়। এমন কি যদি কাঁচা মাল উৎপাদনের স্থায়ী ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে করা সম্ভবপর হয়, তা হ'লে শিল্পগুলির যথেষ্ট উন্নয়ন করাও সুদূরপরাহত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, গ্রামে যদি তুলা

ও সরিষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, তা হ'লে চরকার সুতার ও ঘানির তৈলের অভাবই থাকে না। তাঁতি, কলু, কামার, ছুতার ও মুচি দু-পয়সা উপায় ক'রে মোটা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। এ ছাড়া যে-সমস্ত কাঁচা মাল দেশে প্রচুর রয়েছে, সেগুলিরও সদ্ব্যবহার হতে পারে। নিম্নে তাই বাঁশের, তালগুড়ের ও তালপাতার টুপির কথা কথা উল্লেখ করছি।

বাঁশশিল্প। বাঁশ বাংলাদেশের সর্বত্রই হয়। পাহাড়ে-বাঁশ য-বাঁশ ও র-বাঁশ তন্মধ্যে প্রধান। বাঁশ থেকে বহুবিধ শিল্পদ্রব্য ও গৃহ-নির্মাণ ও মেরামতি হয়ে থাকে। বাঁশচাষ ও বাঁশের শিল্পদ্রব্য নির্মাণ ক'রে অনেকে অনেক টাকা উপায় করে। এখন বাঁশের তিন গুণ দর বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ ক'রে বর্ধমান বিভাগের ডোমদের বাঁশই প্রধান উপজীবিকা। বাঁশের মোড়া, চেয়ার, বাস্‌কেট, জাফরী, ঝুড়ি, কুলা, পেছে, চালুনী, সাজি, টপ্পর, ধানের হামার, মই, ডোল, গাড়ি, খাল্লা, মাচা, প্রভৃতি আবশ্যক ও কৃষিকার্যের জিনিস তৈরি ক'রে ডোমরা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। অনাবাদী জমিতে, নদীতীরে, খোয়াইয়ে ও গৃহের সন্নিকটে বাঁশঝাড় দেখা যায়। পাহাড়ের বাঁশের ব্যবসাও আয়কর। ভাল বাঁশঝাড়ে বৎসরে বর্তমানে কম পক্ষে ২৫৲ টাকা আয় হচ্ছে। এক বিঘা জমিতে ১৫ ঝাড় ভাল বাঁশ হতে পারে। প্রথম বছর বাশের গোঁড়া বসিয়ে দ্বিতীয় বছরে ধানের চিটা ও মাটি দিতে হয়। তৃতীয় বছরে তা হ'লে বহু বাঁশের কোঁড়া বেরুতে পারে। পাচ বছরে দু-একটা বাঁশ কাটবার মত হয় এবং যতটা কাটা যায় তার তিনগুণ কোঁড়া গোড়া থেকে ফুটে উঠে। আজকাল অনাবাদী জমি'তে এইরূপ বাঁশের চাষ করলে পল্লীর আয়বৃদ্ধির কাজে বিশেষ সহায়তা করা যায়। দেশের বাঁশশিল্পীরা উল্টো পথে মরতে বাধ্য হয় না। এমন কি শিল্পীরা মানব-স্বভাবের মধ্যে যে সহজাত সৃষ্টিশক্তি রয়েছে, তার

প্রতি অন্যান্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে। অর্থলোলুপগণ ক্রেতার স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থকে ষোল আনার উপরে সতেরো আনা ছিনিয়ে নিতে পারে না। সকলেই জানেন, দেশে বাঁশের মোড়ার যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে। আপাতত বোলপুর থেকে প্রতিদিন এক মালগাড়ি মোড়া বোঝাই হয়ে কলকাতায় চালান যাচ্ছে। যানবাহনের অসুবিধার জন্য এই মোড়া দেশ-বিদেশের চালান দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না, নতুবা আমেরিকাতেও মোড়া চালান যাচ্ছিল। এই মোড়ার বদলে পূর্বে ডোমেরা ভাত-কাপড় সংগ্রহ ক'রে আনত। পুরাতন কাপড় দিয়ে আজও পশ্চিমবঙ্গে বাঁশের জিনিস কেনবার রেওয়াজ রয়েছে। ১৯২৭ সালের পশ্চিম-বঙ্গের দুর্ভিক্ষের সময় স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় গরীব শিল্পীদের হাতের কাজ কেনবার ব্যবস্থা করেন। এই সময় বাঁশের জিনিস কেনা হ'ত। অতঃপর তিনি এই শিল্পটির প্রতি বিশ্বভারতীর শিল্পভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। শ্রীনিকেতন শিল্পবিভাগ দুই জন ডোমকে মোড়ার উপর নূতন ধরনের কারুকার্য শিক্ষা দান করেন। বাঁশ ও তাল বেত দিয়ে শিল্পীরা 'দেখনাই-সই' জিনিস তৈরি করতে থাকে। গঠনের বৈচিত্র্যে মোড়া-শিল্পটি সকলের দৃষ্টিতে আসে। অতঃপর শিল্পীগণ মোড়ার উপরে চামড়ার গদি বসাবার ব্যবস্থা করেন। শিল্পীর ছোঁয়াচে জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজনের জন্য মোড়ার খরিদ্দার ও বাজার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এই মোড়ার দ্বারা যেমন সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা যৎসামান্য তৃপ্ত হচ্ছে, সেইরূপ দেশের এমন অনেক শিল্প রয়েছে যার সামান্য উদ্যোগ ও আয়োজন করলে শিল্পিগণ অন্নসংস্থানের উপায় করতে পারে, এবং দরদী শিল্পীর সাহায্যে অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প কাজগুলিও মোড়ার মত উন্নত হতে পারে। অবশ্য যাঁরা শখের অথবা সুনামের জন্য কাজ করতে চান, তাঁদের উন্নয়নকাজে

হাত না দেওয়াই ভাল। যাঁদের বাস্তবিক পল্লীর মঙ্গলের জন্য খাঁটি ব্যবসায়ীর মত এই কাজ করবার অথবা করাবার যোগ্যতা আছে, তাঁদেরই ভার গ্রহণ করা উচিত।

তালগুড় তৈরি—সারা বাংলাদেশের কথা জানি না। বীরভূমে ১১ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ লোক ইউনিয়ন বোর্ডের করভার বহন করে। এরা অনেকেই হয়তো আবশ্যকমত চিনি পাচ্ছে না। কিন্তু মোটামুটি বলা যায়, সাত লক্ষ বাদে আর চার লক্ষ লোক চিনি কেনবার পারমিট পায় নাই। গরীব ব'লে এদের সাত আনা সেরের চিনি কেনবার অধিকার ছিল না। বারো আনা ও দশ আনা সের গুড় কিনতে বাধ্য ছিল। পথ্য ও অন্যান্য কাজের জন্য চিনিও দেড় টাকা মূল্যে তাদের কিনিতে হ'ত। গ্রামের মাঠে দশ বছর আগে যতটা ইক্ষুচাষ হ'ত, আজ তার স্থান বড় জোর দু-দশ কাঠা বেড়েছে। গুড় ও চিনির অভাবে গ্রামের অধিকাংশ লোকই নানা কথা বলাবলি করছে, কাজের বেলায় কেউ এক পা অগ্রসর হচ্ছে না। তালগুড় তৈরি করবার লোক নিযুক্ত ক'রে যদি গ্রামের যাবতীয় তালগাছের রসকে কার্যকরী করা যায়, তা হ'লে পল্লীর চিনি-সমস্যার সমাধান কিছুটা হয়। এক মণ গুড় প্রতিদিন তৈরি করবার জন্য প্রায় দেড়শো গাছের প্রয়োজন। দশটা ক'রে গাছের জন্যও যদি এক জন ক'রে লোক রাখা যায় তা হ'লে প্রতিদিন সতেরো আঠারো টাকা খরচ ক'রে এক মণ তাল গুড় পাওয়া যায়। এই গুড় অন্যান্য গুড়ের অপেক্ষা সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয়।

তালগাছের পাতা থেকে চাটাই, ঝুড়ি এবং ছাতা তৈরি হয়। কর্মসচিব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে তালপাতার টুপি করিয়েছিলেন। আজ সেই টুপির এত খরিদ্দার হয়েছে যে, কারিগরগণ বরাতি টুপি তৈরি ক'রে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন তখন তিনি এই তাল-পাতার: টুপি ব্যবহার করেছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি এবং কর্মীদের সঙ্গে তাঁর নোয়াখালি পরিক্রমণের একটা চিত্র এইখানে প্রদত্ত হ'ল।

তালগাছের পাতা কেটে ভাল ভাবে পাতাগুলিকে জাঁত দিয়ে এক দিন রাখতে হয়। তার পরদিন বাঁশের মিহি বাতা ক'রে একটা টুপির মত ছক তৈরি করা খুব সহজ। ছকের উপর পাতাগুলি ছাতার মত ছাইয়ে দিলে ভাল দেখায়। তারপর শণের মিহি সুতা দিয়ে তালপাতাগুলিকে সেলাই করলেই টুপিটী ভাল মানায়। যদি একটা গলাবন্ধ দেওয়া যায়, তা হ'লে মাথা থেকে টুপিটা উড়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। সোলার টুপির চেয়ে এই টুপি মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ছাতির অপেক্ষা টুপির একটা বৈচিত্র্য শিল্পীর ছোঁয়াচে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য এই টুপিকে এখানকার ছাতির ন্যায়ই অনেকে ব্যবহার করছেন, দামও খুব সস্তা—মাত্র এক টাকা। বাঁশ দড়ি ও পাতার মূল্য মাত্র দু আনা। গ্রামের ব্যবসায়ীকে কিছু দিয়ে বারো আনার কাছাকাছিই গরীব শিল্পী পেতে পারে। ভাল অভিজ্ঞ কারিগরকে প্রতি দিন অন্তত আটটা টুপি করতে দেখা গিয়েছে। টুপিগুলির সমান মাপের জন্য একটা কাঠের ফরমা করতে বড় জোর পাঁচ টাকা খরচ করতে হয়। হাটে বাজারে ও ছোট বড় শহরে এইরূপ টুপি হাজির করলেই খরিদ্দারগণ ছুটে আসে। এইরূপ তালবেতের দ্বারা শীতলপাটীর অপেক্ষা ভাল মসৃণ চকচকে পাটী তৈরি হয়। মোড়ার উপর যাবতীয় কারুকার্য এই তালবেতের দ্বারাই হয়ে থাকে। তালবেত ছাড়িয়ে কাদামাটিতে কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে ইচ্ছামত কালো ও বাদামী রঙ করতে পারা যায়। এ থেকে আরও বিভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্য গ'ড়ে উঠতে পারে।

দেশের কর্তব্য। এখন আসল কথা হচ্ছে, তালপাতার টুপি তাল-গুড় প্রভৃতি করবার উপায় কি? গ্রামের অর্থলোলুপগণ যদি এ কাজের গোড়াপত্তন করতে চান, তা হ'লে গরীবের অবস্থা পূর্ববৎ থাকবে। গরীবদেরই পল্লীতে পল্লীতে এ কাজের আয়োজন করা উচিত। তাতে

গ্রামবাসীদের সহযোগিতার অভাব হবে না। পরস্পরের প্রয়োজনের তাগিদে সহজেই তারা এক হতে পারবে। আজকে কুমোরের ঘরে সকলকে হাজির হতে হচ্ছে। কলুকে সরিষার ও তিলের বানি দিয়ে অনেকে তৈল তৈরির মতলব করছে। কিন্তু কাগজীরা মাথা ঠুকে খড়-বাঁশ-শর জোগাড় ক'রেও মালমশলার অভাবে কাগজ তৈরি করতে পারছে না। সেদিন গুলজারবাগে গৃহশিল্পগুলির জন্য বিহার সরকারের যে উদ্যোগ-আয়োজন দেখে এসেছি, তাতে মনে হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁরা গৃহশিল্পের নূতন যুগ সৃষ্টি করবেন। আমাদের সরকার যদি গরীব শিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে করতে না পারেন, তা হ'লে দেশের গরীবরা সোজাসুজি মরতে পারে না, উল্টো পথে ধুক্‌পুক্ ক'রে মরবে। সরকার যত টাকা কারখানা-শিল্প প্রবর্তনের জন্য ব্যয় করছেন, তত টাকাই যদি গরীবদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যয় করেন তা হ'লে দেশের বুকে সত্যই শিল্প-উন্নয়নের নূতন শিকড় চালাতে পারবেন। তখন অর্থলোলুপদের আর সুবিধা থাকবে না। গরীবরা মোটা খেয়ে-প'রে যেন তেন প্রকারে এ দুর্দিনে টিকে থাকতে পারেবে। গরীব এক সের চাল কিনে ভাতের মাড খেয়ে একটা বেলা কাটাবার ইচ্ছে করে, কিন্তু কলের চালের মাড় খেতে পারে না। খাদ্যপ্রাণ ও জীবনীশক্তির অভাবে যদি এই ভাবে শুধু রুগ্ন ও দুর্বলদের মৃত্যু হ'ত তা হ'লে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ চোখের উপরেই পল্লীর শিল্পীদের এইভাবে মরণ দেখতে হচ্ছে। এই দুর্দিনে মূলধন দিয়ে, উন্নয়ন কাজ শিক্ষাদান ক'রে যদি দেশের লোক দেশের দরিদ্র হরিজন শিল্পীদের রক্ষা না করে, তা হ'লে শুধু পরস্পরকে গালাগালি দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবে না, হরিজনদের জীবনের মানদণ্ড অনুন্নত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে।

—'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৫১

"হরিজনদের সহিত পংক্তিভোজনে কংগ্রেস-সেবকদের মধ্যে আজ আর কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতার যে বিষ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইলে আমাদের সকলকেই হরিজন হইতে হইবে। সেই জন্যই সেবাগ্রামের যে সকল যুবক যুবতী বিবাহ করিতে চায়, তাহাদিগকে আমি এই কথাই বলি যে, বর ও কন্যা দুই পক্ষের একজনকে অন্তত হরিজন হইতেই হইবে।"

—মহাত্মা গান্ধী

হরিজন সম্মেলনের অভিভাষণ

(পুইনান, হুগলী)

হরিজন সভায় সভাপতির আসনে বসিয়ে আপনারা আমার প্রতি আজ যে সম্মান দেখিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে সে সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। সে সম্মানের প্রকৃত অধিকারী দেশের সমগ্র হরিজন তথা দরিদ্র শ্রেণী,—আমি তাদের একজন প্রতিনিধি মাত্র। তাদেরই হয়ে আমি আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হাত পা মাথা প্রভৃতি যেমন মানব-দেহের এক-একটি অঙ্গবিশেষ, দেশের হরিজন শ্রেণীও তেমনি হিন্দু সমাজের একটি অবিভাজ্য অঙ্গ। আজ পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুদের সামাজিক দুরবস্থা ও সঙ্কীর্ণতার কলঙ্কে আমরাও কলঙ্কিত। সে কলঙ্কমুক্তির জন্য চাই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

পশ্চিম-বাংলা আজ হয়ে উঠেছে সমস্যাবহুল। দিকে দিকে আজ অন্তহীন সমস্যা মানুষকে ক'রে তুলেছে অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী। অন্নবস্ত্র-সমস্যা দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠেছে। গ্রামরক্ষা ও গ্রাম-ব্যবস্থায় রয়েছে বহু বাধা। অবিচার অত্যাচার ও অভাবে জীবনকে ক'রে তুলেছে আরো দুর্বিষহ। সর্বত্র এই বিশৃঙ্খলা, অশান্তি। অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অবস্থা পশ্চিম-বঙ্গবাসীকে ক'রে তুলেছে রাষ্ট্র-বিরোধী। এই সুযোগ নিয়ে দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রচারকার্য চালাতে শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই সব প্রচারকার্যের ফলে হরিজন সম্প্রদায় আজ বিভ্রান্ত। হরিজনরা নিজেদের উন্নতির জন্য প্রকৃত মত ও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মদ্যপান ও জুয়াখেলার

কুফল হরিজনরা আজ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে পশ্চিম-বঙ্গের ৪৭ লক্ষ হরিজনদের মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষই তাড়ি গাঁজা চরস প্রভৃতির অনুরক্ত। আশা করি, পশ্চিম-বঙ্গ-ব্যবস্থা-পরিষদে সত্বর মাদকদ্রব্য-বর্জন বিল গৃহীত হবে, ইতিমধ্যে দুইটা জিলায় কার্য আরম্ভ হয়েছে। নইলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায়ই নেই। আরো কতগুলি কুপ্রথা হরিজনদের মধ্যে প্রচলিত আছে, যথা—বাল্যবিবাহ, বালিকা-বিক্রয় প্রভৃতি। দরিদ্র এবং শিক্ষাহীনতার জন্য এ সবের প্রতিবিধান করা সম্ভব হচ্ছে না। কলকারখানা প্রভৃতিতে হরিজন স্ত্রী-মজুরদের নৈতিক অবনতির কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। হরিজনদের নৈতিক দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েই কলকারখানার দুষ্ট লোকেরা ছলে বলে কৌশলে তাদের হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে। এই সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি হরিজনরা আজো সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তবে তাদের আর আশা কোথায় ?

আগেকার দিনে হরিজনদের শরীরচর্চা ও নৃত্য-গীতাদির প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। পল্লীকবি বৈষ্ণবসাধক ও বাউল আজও হরিজনদের মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়। এই দিকে হরিজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, কেন না, এই সবের ভিতর দিয়ে তাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধনের সম্ভাবনা। কলা-চর্চায় অনুরাগী হ'লে জীবনের মানও অনেক উন্নত হয়। অন্তরের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিসমূহ থেকেও তারা বঞ্চিত নয়। সমাজের অত্যাচারে সে সব সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। পল্লীতে পল্লীতে বস্তিতে বস্তিতে সংবাদপত্রপাঠ ও ছায়াচিত্রাদির ব্যবস্থা হ'লে পল্লী-উন্নয়ন কাজ অনায়াসেই সার্থক হতে পারে। সব-কিছুর প্রতি হরিজনদের

অধিকারবোধকেই সর্বাগ্রে জাগ্রত করতে হবে। সেইজন্য চাই ধৈর্য, চাই পরিশ্রম, চাই পরিকল্পনা।

হরিজনদের আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সরল কৃষিকাজ, সবজী চাষ, মৎস্য চাষ, পশু-পালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য অনাবাদী জমির উপর নূতন হরিজন-পল্লী স্থাপন ক'রে শাক সবজী ও ফল ফুলের বাগান এবং জলাশয় করতে হবে।

অস্পৃশ্যতা বর্জন

অধিকারহীন হরিজনদের পল্লীসমাজে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। পল্লীর প্রতিটি পূজা-পার্বণে, প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্বীকার ক'রে নিতে হবে তাদের যোগাযোগ ও অধিকার। আসুন, আমরা সমবেত ভাবে বলি—

(১) সাঁওতাল অধিবাসীদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(২) পংক্তি-ভোজনে কোনরূপ তারতম্য থাকবে না, হিন্দু মাত্রই হিন্দুর সঙ্গে আহারে, বসবাসে ও বিশ্রামে সম অধিকার লাভ করবে।

(৩) গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রহাচার্য, নাপিত, ধোপা প্রভৃতিকে সকল শ্রেণীর হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) ব্যক্তিগত মন্দির ব্যতীত সর্বজনের ধর্মকার্য সেবাকার্য ও জনশিক্ষার জন্য যা কিছু সম্পত্তি, মন্দির ও অর্থাদি উৎসর্গ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মালিক গ্রামের পঞ্চায়েৎরাই হবে।

(৫) নিম্ন বা অস্পৃশ্য জাতি ব'লে যদি কেউ কোনরূপ তারতম্য ও বিভেদ সৃজন করেন, তাঁকে আইনত দণ্ডদানের যথাযথ ব্যবস্থা করবে সমবেত পল্লী-সমাজ।

(৬) দশ বৎসর যাবৎ কৃষিশিল্প, ডাক্তারি, কারিগরী বিদ্যালাভের জন্য

যে সমস্ত বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে, তাতে যথেষ্ট সংখ্যক হরিজন শিক্ষার্থীকে স্থান দিতে হবে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্রী ও ছাত্র তাতে বিনা বাধায় স্থান পাবে।

তা হ'লেই হবে প্রকৃত পল্লী-উন্নয়ন। পল্লীবাসীর বৃহৎ একটা অংশকে বঞ্চিত রেখে পল্লীর কোন সংস্কারই সম্ভব নয়। আজ অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে হরিজনদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বিবিধ রকমের কুসংস্কার। তাদের উন্নতির পথে ওসবও কম বড় বাধা নয়। ভূত, প্রেত, ডান, ডাকিনী প্রভৃতির আতঙ্কে আজও ওদের অনেক শুভ প্রচেষ্টাই ব্যাহত হচ্ছে। ওদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত, ওঝা, ওস্তাদ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক পরিত্রাতারূপে ওদের আরও সর্বনাশ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। দৃঢ়হস্তে আজ এদের দমন করতে হবে। শিক্ষার আলোকে দূর করতে হবে কুসংস্কারের অন্ধকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হরিজন-নারী-সমাজকে জাগ্রত করা। গ্রামে গ্রামে মহিলা-সংগঠনের সাহায্যে হরিজন মেয়েদেরও অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে হবে, কেন না, কুসংস্কার মেয়েদের মনেই সবচেয়ে বেশি বদ্ধমূল হয়ে আছে, ওঝা পুরোহিত প্রভৃতির প্রভাব মেয়েদের উপরেই সবচেয়ে বেশি।

আজ নামের শেষে ব্যবহৃত পদবীই হয়ে উঠেছে মানুষের একমাত্র পরিচায়ক। পদবী দিয়েই বিচার করা হচ্ছে মানুষের অধিকারের সীমা। পদবীই ব'লে দিচ্ছে, কে অস্পৃশ্য আর কে সমাজের পূজনীয়। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে পদবীর একেবারে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। যতদিন পদবী থাকবে, ততদিন জাতিভেদ থাকবে। যতদিন পদবী একেবারে লুপ্ত না হবে, ততদিন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হবে না—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

কেন না, এই পদবীই মানুষের কাছ থেকে মানুষকে পৃথক ক'রে রেখেছে। এই বিষয়ে আমি দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমানে হরিজনরা আরও একটি বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু পেয়েছি ভারত-বিভাগের বিনিময়ে। আজ হরিজনদের বৃহৎ একটি অংশ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পাকিস্তানে প'ড়ে আছে। আর একটি বৃহৎ অংশ আজ ভারত সরকারের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে যাযাবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যদি অবিলম্বে আমরা এদের জীবিকা ও আশ্রয়ের সংস্থান না করি, তবে নিরুপায় হয়েই এদের একটি বৃহৎ অংশ বিধর্মী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এরা রাজনীতি বোঝে না, হিন্দুস্থান পাকিস্তান বোঝে না, এরা শুধু চায় বেঁচে থাকবার অধিকার। আমাদেরই কৃতকর্মের ফলে সে অধিকার থেকেও যদি ওরা আজ বঞ্চিত হয়, তবে তার চেয়ে দুঃখ লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? অতএব আমাদের আশুকর্তব্য হ'ল এদের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য যে কোন স্বার্থত্যাগের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

অবিলম্বে পল্লীতে পল্লীতে স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন করতে হবে, পথে পথে ভ্রাম্যমাণ অসহায় নিঃসম্বল হরিজনদের আশু মৃত্যু অথবা ধর্মান্তর থেকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব এদেরই নিতে হবে। সরকারের উপর নির্ভর ক'রে থাকলে চলবে না, হরিজন ভাইদের সাহায্যে হরিজনদেরই এগিয়ে আসতে হবে সর্বপ্রথম। আমাদের শুধু পূর্ব-বঙ্গের দুর্গতদের উপর দৃষ্টি দিলেই চলবে না, আমাদেরই আশেপাশে যে সমস্ত হতভাগ্য চিরবঞ্চিত সর্বহারার দল—খাদ্য বস্ত্র ও স্বাস্থ্যের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে

প'ড়ে আছে, তাদের উদ্ধার করবার ব্রতও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ১৩৫০ সালের অবহেলার জন্যই এদের স্বাস্থ্য সত্যই একেবারে ভেঙে পড়েছে, অভিশপ্ত জীবন এরা যেন আর বহন করতে পারছে না। এদের কানে দিতে হবে অভয় মন্ত্র, এদের শোনাতে হবে আশার বাণী, এদের করতে হবে পুনর্জীবিত। স্বাধীনতার আস্বাদন থেকে এরাই যদি বঞ্চিত রইল, তবে স্বাধীনতা কাদের জন্য? লক্ষ লক্ষ সর্বহারার আর্তনাদই যদি না থামল, তবে কোথায় রইল আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ?

হরিজনদের বস্ত্রসমস্যা

বস্ত্রসমস্যাই বর্তমানে পশ্চিম-বাংলার প্রধান সমস্যা। বস্ত্রাভাবে হরিজনগণ সমস্ত সমস্যার জন্য সরকারকেই আজ দায়ী করছেন। এই সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা আমি আপনাদের বলতে চাই।

আপনারা জানেন যে, জনসাধারণের ইচ্ছাতেই একদিন বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই জনমতের চাপেই আর একদিন সহসা বস্ত্রের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল। আজ আবার আপনাদের জন্যই বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের যথাযথ কঠোর ব্যবস্থা সরকার করছেন। জনমত উপেক্ষা করবার মত অধিকার ও শক্তি সরকারের নেই, কিন্তু বস্ত্র সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হোক না কেন, ব্যাপক দুর্নীতি যতদিন না দেশ থেকে দুরীভূত হয়, যতদিন না জনসাধারণের নীতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, ততদিন বস্ত্রসমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। এ কথা স্বীকার করতে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন বাধা নেই, বর্তমান বস্ত্রসংকটের জন্য দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের দুর্নীতিই আজ বহুলাংশে দায়ী। আজ বস্ত্রের জন্য পশ্চিম-বাংলায় হাহাকার রব প'ড়ে গেছে, অথচ সেই পশ্চিম-বাংলা

থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র গত কয়েক মাসে অবৈধভাবে পাকিস্তানে চালান হয়েছে তা থেকেই নিঃসন্দেহে পশ্চিম-বাংলার বস্ত্রসমস্যার দুর্গতি মোচন করা যেতে পারত।

এই দুর্নীতি কিরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়।

বি. টি. এ. সদস্যগণ, যাঁদের উপরেই ছিল বস্ত্র সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, এ বস্ত্র-সংকটের দায় থেকে আজ তাঁরাও মুক্ত নন। মিল-মালিকদের সহযোগিতায় তাঁরাও যে বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য অতিশয় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, এ কথা আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি। শুধু তাঁরাই নন, কোন কোন সরকারী কর্মচারী ও সীমান্তরক্ষী প্রহরী থেকে শুরু ক'রে দেশের অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিও আজ এই অবৈধ ভাবে বস্ত্র চালান ব্যবসায়ে নিযুক্ত। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ যেখানে চোরাকারবারী হয়ে অবাধে বিচরণ করছে, সেখানে সরকারের পক্ষে সে দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজসাধ্য নয়।

সরিষার তেল ও চিনি বিনিয়ন্ত্রণের পর যেমন কিছুদিনের মধ্যে তেল ও চিনির অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর জাতীয় সরকার সেই স্বাভাবিক অবস্থাই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব শুধু সরকারকেই দায়ী করলে চলবে কেন?

আপনারা অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, বস্ত্রের চোরা-চালান বন্ধ করবার জন্য সরকার বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না ব'লেই চোরাকারবারীদের চোরা চালান বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাকিস্তান সীমানায় অবস্থিত

জেলাগুলিতে সরকার আজ ব্যাপক পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। সুদীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চলে দিবারাত্রব্যাপী সজাগ প্রহরী আজ পাহারায় নিযুক্ত। স্থলপথ, জলপথ ও ব্যোমপথ, কোন পথেই সরকার আজ নির্লিপ্ত হয়ে ব'সে নেই। কিন্তু এ কথাও আপনারা স্বীকার করবেন যে, ৭০০ মাইল দীর্ঘ সীমারেখা দিবারাত্র পাহারা দেওয়া খুব সহজসাধ্য কাজ নয়, বিশেষ ক'রে যে স্থানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী আজ সেই চোরা চালানের কাজে নিযুক্ত। আমি আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জনসাধারণের মধ্যে নীতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হ'লে, তাদের সহযোগিতা না পেলে এই দুর্নিবার দুর্নীতি প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য। কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, সরকার এই চোরা চালান বন্ধ করবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা যে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এই সব চোরাকারবারীদের জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান না করায় পক্ষান্তরে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এ অভিযোগও মিথ্যা। পুলিস ও সীমান্তরক্ষীরা সেই দণ্ড দেবার অধিকারী নন। তাঁরা যে সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে বিচারালয়ে উপস্থিত করছেন, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই আজ তারা দণ্ডকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আজ দুর্নীতি এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে আইন এই সব দুর্দান্ত দুষ্কৃতিকারীদের স্পর্শ করতে পারছে না। চোরাকারবারীরা আজ এত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে যে, সংঘবদ্ধভাবে তারা চোরাকারবারে নিযুক্ত। শুধু চোরাকারবারীদের এই অবৈধ ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপকে নিন্দা করলেই যথেষ্ট হয় না ব'লেই জাতীয় সরকার দুর্নীতি দমনে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়েছেন।

আমি আপনাদের কাছে বেশ জোর দিয়েই আজ বলছি, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বর্তমান নীতি হ'ল এই যে, সরকারী, বেসরকারী যে কোন লোক এই সব দুষ্কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কালবিলম্ব করবেন না।

লীগ আমলে যে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা জনসাধারণকে সব দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করেছিল, বিগত পাঁচ মাসের মধ্যে সে সবের প্রতিবিধান সরকার করতে যদিও এখনও সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হন নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হচ্ছেন। এ সব কাজে জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেলে সরকার সমস্ত সঙ্কটই শীঘ্র কাটিয়ে উঠবার আশা রাখেন। সমবায় বিভাগের সাহায্যে এবার বস্ত্র বণ্টন ও বিক্রি হবে।

কংগ্রেস ও গান্ধীজী

এবার আমি ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের প্রতি এক লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে একজন ক'রে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। পশ্চিম-বাংলায় হরিজনদের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা ৪০ লক্ষ, বর্ণহিন্দু এবং অন্যান্য শ্রেণীর সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লক্ষ; সর্বসমেত ২ কোটি ৫২ লক্ষ জন লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই ২.৫০ জনের কমে পশ্চিম-বাংলার পরিষদ দল গঠিত হবে না। অতএব আশা করা যায় যে, বর্তমানে যে ১৩ জন তপশিলী পরিষদ-সদস্য রয়েছেন, অদূরভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা ৫০এ গিয়ে পৌছবে। এই ৫০ জন প্রতিনিধির নিকট আমরা কি কি প্রস্তাব ও কর্মপন্থা উপস্থাপিত করব, সেই বিষয় আজকের সভায় আলোচনা হওয়া

উচিত। আমাদের এই কর্মপন্থা যদি দেশের ও দশের পক্ষে কল্যাণকর হয়, তা হ'লে আমি মনে করি যে কংগ্রেস তা সাদরে গ্রহণ করবেন।

বর্তমানে কংগ্রেসের কর্মপন্থাই আমাদের পক্ষে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিনীত ভাবে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, মহাত্মাজীর তিরোধানের পর সত্যি আমরা ভাগ্যহীন হয়ে পড়েছি। তিনিই একাধারে ছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর তিরোধানে আমরা যা হারিয়েছি, তা বাস্তবিকই অপূরণীয়। বাপুজী আমাদের জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ ক'রে ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করেছিলেন, এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও শুভেচ্ছা আমরা আজ আর কার কাছে আশা করতে পারি? হরিজন-উন্নয়নের জন্য তিনি আজীবন যে কঠোর সাধনা করেছেন, তাঁর সেই আরব্ধ কর্মকে সফল করবার দায়িত্ব আমাদেরই। আমার বিশ্বাস, তাঁর এই মহান কল্পনা ব্যর্থ হবে না। আজকের এই দুর্দিনে তার সেই অমরবাণী এজন্য সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি।

পশ্চিম-বাংলার অস্পৃশ্যতার রূপ

হাজার করা অস্পৃশ্যের সংখ্যা

৪৭৩ জন	১৯২১ খৃঃ
৩৭৮ জন	১৯৩১ খৃঃ
২৭০ জন	১৯৪১ খৃঃ
২৬০ জন	১৯৪৮ খৃঃ

শপথে বৈষম্য—ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে আয়ুধ দ্বারা, বৈশ্যকে গো দ্বারা এবং শূদ্রকে স্ত্রীপুত্রাদির শির স্পর্শ দ্বারা শপথ ও পরীক্ষা আগে করানো হত। বর্তমানে সকলকে সত্য দ্বারা শপথ করানো হয়।

জ্ঞানদানে বৈষম্য—ঋষি অত্রি বুঝি বলেছিলেন, যে গ্রামে অন্ত্যজ জাতি বসবাস করবে সে গ্রামে বেদ অধ্যয়ন নিষেধ। বর্তমানে অস্পৃশ্য তো দূরের কথা, ম্লেচ্ছ যবন যাদের পূর্বে বলা হ'ত—তারাও বেদ অধ্যয়ন করেন।

অন্ন উৎপন্নকারীকে অন্নদানে ও বাসস্থানে বৈষম্য—দশম অধ্যায়ে মনুসংহিতায় লেখা রয়েছে, যাদের বাসস্থান গ্রামের বাইরে, কুকুর গর্দভ একমাত্র ধন, মৃতের বস্ত্র পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহনির্মিত অলঙ্কার আভরণ, যাদের সাধুদের বৈধ কর্মানুষ্ঠানের সময় দর্শন নিষেধ—এদের অন্ন দিতে হ'লে ভগ্নপাত্রে দিবে। বর্তমানে রৌপ্যপাত্রে অন্নদান করবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হচ্ছে।

অন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ছিল—ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্যের অন্ন অন্নমাত্র, শূদ্রের অন্ন একেবারে রুধিরবৎ অভক্ষ্য। বর্তমানে

সরকারী ভোজনালয়ে এবং অন্নসত্রে শূদ্রের অন্ন অপহরণ ক'রে যেমন অনেকে অমৃতবৎ মনে করছে, সেরূপ শূদ্রও আঁধারে ঠাকুরের মুখের অন্ন গলধঃকরণ ক'রে প্রাণরক্ষা করছে।

নামকরণে বৈষম্য ছিল—

ব্রাহ্মণের শুভশর্মা নামকরণ হইত
ক্ষত্রিয়ের বলবর্মা নামকরণ হইত
বৈশ্যের বসুভূতি নামকরণ হইত
শূদ্রের দীনদাস নামকরণ হইত

এখন শূদ্র নিজকে বলে শুভময়, অকর্মণ্য ব্রাহ্মণকে বলে বলহান, বসুমতীর দীন হীন অধম।

পল্লীবাসীর অশিক্ষার জন্য ধারণা হয়েছিল—

(১) প্রথম দফায় ধান থেকে চাল করলে যে অন্ন তৈরি হয়, তা গ্রহণ করলে দোষ নাই। দ্বিতীয় দফার চাল থেকে অন্ন ভক্ষণ করলেই নরকে যেতে হয়—কিন্তু এখন বুঝেছে, এর মূলে কোন যুক্তি নাই।

(২) ঘৃত, দুগ্ধ, গুড়, চিঁড়া, মুড়ি প্রভৃতি ধীরে ধীরে খাদ্যদ্রব্য যেমন সকলেই এখন গ্রহণ করেছে, সেইরূপ জলচল করতে, একত্রে আহার করতে, একত্রে আসন গ্রহণ করতে অনেকের বিশেষ কোন অসম্মতি নাই।

অসম্মত ব্যক্তি তবে কারা ?

যারা ঐক্য মিলন ভাববর্ধনে বাধা দেয়।

যারা বর্ণ ও মত নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার দিতে চায় না।

যারা অধিকার হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে উপলব্ধি ক'রেও নানা কুযুক্তি প্রদান করে।

যারা পল্লী-সমাজের মামলা মকদ্দমার দালাল এবং নানা ষড়যন্ত্রকারী এবং অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী।

যাদের নৈতিক চরিত্র দুর্বল, হরিজন স্ত্রী-পুরুষদের নিয়ে অবাধ মেলামেশা ক'রে এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে কালাতিপাত ক'রেও অসবর্ণ বিবাহে বাধা দেয়।

যারা বৌদ্ধদের, শিখদের, অনার্যদের, ব্রাহ্মদের এবং অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুদের হিন্দু ব'লে স্বীকার করতে হ'লে নানারূপ গলাবাজি করে।

যারা স্থানীয় সরকারী বেসরকারী কর্তৃপক্ষ হয়েও নানা কৌশলে অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যে বাধা দান করে।

যারা সর্বসাধারণের সেবক, পেশাদার ভৃত্য এবং মন্দিররক্ষক।

যারা বিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়ের কৃষিশিল্প-ভবনের কর্মী এবং কর্তা হয়েও অস্পৃশ্যদের অবজ্ঞা করে এবং তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে।

এই সমস্ত অসম্মত ব্যক্তিদের সম্মত করাবার জন্য—আইনত চোর, ডাকাত, পল্লীশত্রু এবং বহিঃশত্রুর ন্যায়দণ্ডদানের বিহিত করা হয়েছে, সেইরূপ সমাজশত্রু নামে দণ্ডের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তা হ'লেই অসম্মত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস হবে এবং হিন্দু সমাজ থেকে ঘৃণা, ঈর্ষা, অবজ্ঞা ভাব দূরীভূত হবে।

জমিদারী উচ্ছেদ

এবং

চাষী-মজুরের দাবি

"কৃষি বিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ : 'রাশিয়ার চিঠি'

হরিজনরা সকলেই চাষী-মজুর। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, দেশে প্রকৃত চাষী-মজুর সংঘ আজও ভালভাবে গ'ড়ে উঠে নাই। ফলে চাষী-মজুররা ভূমির দাস হয়ে পড়েছে—জমির মালিকদের খামখেয়ালির উপর তাদের জীবন নির্ভর করছে। এতে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কেন না, আর অধিক দিন চাষী-মজুররা এক-পা জমিতে আর এক-পা কল-কারখানায় রেখে টিকে থাকতে পারবে না। অবিলম্বে জমির মালিকের এবং মূলধনীর শোষণে সর্বহারা হতে বাধ্য হবে।

এখন কথা হচ্ছে, চাষী-মজুর কারা? সকলেই বোধ হয় জানেন, যে সব কৃষক স্বাধীনভাবে নিজের শ্রমের উৎপন্ন ফসলের মূল্য পায় না, কৃষিকাজের সময় জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না, জায়গা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ক'রে জমির আইনত অধিকারী হতে পারে না, জমিদারগণ মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের শোষণের জন্য এই সব হতভাগাদের লেলিয়ে দেন—এইরূপ কৃষিজীবীদেরই চাষী-মজুর বলা হয়। এদের সংখ্যা কল-কারখানার মজুরের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রায় এক কোটী নরনারী পশ্চিম-বাংলা দেশে রয়েছে, তাদের

মধ্যে আজও কোন বাস্তব আন্দোলন সৃজন হয় নাই। বর্তমান অর্থ-নৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য যদি ধনীরা পুনরায় এদের কথা ভেবেচিন্তে কাজে নিযুক্ত হয়, তা হ'লে শ্রেণীস্বার্থ সমস্বার্থের নামেই জবাই হবে।

পশ্চিম-বঙ্গের চাষী-মজুরগণ বহু নামে পরিচিত। এদের কিরূপে ভূমিদাস করা হয়েছে, তারও নমুনা মজুরির পয়সার মাপে স্পষ্ট বুঝা যায়।

দিন-মজুর।—এরা প্রতিদিন নগদ পয়সায় অথবা চাউলের বিনিময়ে মজুরি খাটে। গড়ে প্রায় দশ ঘণ্টা কাজ ক'রে ॥৵০ আনা থেকে দেড় টাকা মজুরি পায়। স্ত্রী-কন্যাগণও কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মজুরির হার ও কাজের অনিশ্চয়তা এত শোচনীয় যে, এক মাস কাজ না করতে পারলে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে না। তখন পেটের দায়ে সব কিছু করতে বাধ্য হয়। চুরি, ডাকাতি, স্ত্রী-কন্যা বিক্রি এবং নানারূপ প্রতারণাপূর্বক ঋণ গ্রহণও তখন ক'রে থাকে।

মাহিনদার।—জমির মালিকের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে কাজে বহাল হয়। হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক এইরূপ ভূমিদাসের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপন্ন করান। গোয়ালে গরু-বাছুরের মত খেতে দেন। রোগ হ'লে মালিক তাড়িয়ে দেন অথবা ধার দিয়ে সুদের ও আসলের তাগাদায় আজীবন বেঁধে রাখেন। জেলখানার কালাপাগড়ী কয়েদীর মত বছরে তিন টাকা থেকে ৮০৲ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এই টাকার উপর মাহিনদারের সব কিছু নির্ভর করে। ঘর-বাড়ি, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, রোগ-বালাই, দায়-বিপদ এবং চিতার আগুন পর্যন্ত এ থেকেই কিনতে হয়।

কৃষাণ —এরা জমির উৎপন্ন ফসলের ।/৪ পাঁচ আনা চার পাইয়ের বিনিময়ে জমির মালিকের জমিতে চাষাদি করে। অবসর সময়টুকু জমির মালিক নানা কৌশলে চুষে নেন—হয়তো শোষণের বেশি সুযোগ করবার জন্য খাদ্যাদি মাঝে মাঝে দিয়ে থাকেন। তার উপর ধান চাষ করিয়ে ধানের ষোল আনার মধ্যে ।/৪ পাই অংশ দেন, কিন্তু খড়ের (বিচালী) সে অনুপাতে অংশ দেন না। গ্রামের জমির মালিকরা জোট বেঁধে ধানের খড় থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন। দশ বারো বছর যাতে এক জমিতে কৃষিকাজ করতে না পায়, তার প্রতি এই সব মালিক সজাগ। দিন-মজুরের ন্যায়ই কৃষি কাজ করান কেবলমাত্র বছরের চুক্তিতে।

ভাগীদার।—এরা ফসলের ভাগ কৃষাণদের অপেক্ষা ৮ আট পাই থেকে ৶৮ দু আনা আট পাই পর্যন্ত বেশি পায়। কেন না, এদের ফসল চাষের জন্য গরু পালন করতে হয়—বীজ সার প্রভৃতির অর্ধেক অংশ দিতে হয়। যাঁরা ফসলের ॥/০ ন-আনা ॥৶০ দশ আনা অংশ জমির মালিক ব'লে গ্রহণ করেন, তাঁরাও কিন্তু বীজ সার প্রভৃতির খরচ আধাআধি চাপ দিয়ে আদায় করেন। বর্গাচাষী ব'লে স্বীকার করতে হবে এই আশঙ্কায় জমির মালিক দু-এক বছর অন্তর জমিতে আর প্রবেশ করতে দেয় না। এজন্য জমির অবস্থা রূপজীবীদের ন্যায় মলিন হচ্ছে। রসালো ও জোরালো জমির মালিকদের তবু লোভ উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে। অনেকে ভাগে চাষ না করিয়ে কৃষাণ দিয়ে জমি চাষ করাচ্ছেন। এমন কি মাহিনদার রেখেও চাষ করাবার লোভ ত্যাগ করতে পারছেন না। মগজ দিনরাত বাড়তি শ্রমের মূল্য শোষণের জন্য তেতে রয়েছে। অথবা জিভ দিয়ে টস টস ক'রে জল

পড়ছে। ফলে মালিকে এবং ভাগীদারে বিরোধ অন্তরে ও বাইরে জমাট হয়ে উঠছে।

অন্যান্য মজুর, রাখাল বা বাগাল।—এরা গরু চরিয়ে, গরু পিছু ৵০ দু আনা থেকে ।০ চার আনা পয়সা পায়। ছোট ছোট ছেলেরা ভাতের বিনিময়ে গোয়ালে গো-সেবার কাজে বাহাল হয়। গরুর ও ভেড়ার গোয়াল পরিষ্কার করে। সময়মত মাঠে বা নদীতীরে গরু চরিয়ে আনে। সূর্য অস্তের সময় চারটি খেতে পায়। শীতের দিনে শীতবস্ত্রের অভাবে স্নান করে না। শীতে কেঁপে কেঁপে গরু বাছুরের সঙ্গে গোয়ালে খাদ্য খায়—গৃহী এদের একবারে অস্পৃশ্য ক'রে রাখে। এইরূপ জমির কাজে হেটেলী থাকে। ঢেঁকিতে ভানারীও কম মজুরি নিয়ে ধান থেকে চাল তৈরি ক'রে দেয়। অনেক মেয়ে ঘর উঠান ও গোয়াল পরিষ্কার ক'রে ভাত-মুড়ি পায়। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে এই যে, সামান্য ভাত ও মুড়ির বিনিময়ে পল্লীর আবালবৃদ্ধ নরনারী মজুর খেটে চলছে, অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা অথবা শক্তি বৃদ্ধি করবার উপায় নিজেদের লাভের হার কমবে ব'লে জমির মালিকরা করছেন না। ফলে চাষ-বাস, ঘরকন্না ও সমাজের নানা সুনিয়ম আজ অতিলোভীদের খেয়ালের জিনিস হয়েছে। পল্লীর মেরুদণ্ড এজন্য অবাধে ভেঙে পড়ছে। প্রাচীন সংস্কৃতির দোহাই কেউ শুনছে না। শোষণে ও শাসনের ঠেলায় শোষকের মুখে উপদেশবাণী তাই মজদুর ভাইরা শুনতে হ'লে চম্পট দেয়।

তাই লিখছি, বাংলা দেশে দিন-মজুর, মাহিনাদার, কৃষাণ, ভাগচাষী প্রভৃতি চাষী-মজুরগণ বৈপ্লবিক শক্তিকে অন্ন-বস্ত্রের আশঙ্কায় লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে। আজ যুদ্ধের চাপে নবতর সমাজব্যবস্থার এবং

উন্নততর উৎপাদন ও ধনবণ্টন নীতির প্রবর্তনের জন্য বিপ্লবের ডাক এসেছে। এ সময় আত্মবিশ্বাসহীন অমানুষ মজদুরদের সচেতন ক'রে তুললে অসহায় ও অবসাদ ভাব অনেকটা দূর হতে পারে। কিন্তু তার আগে জানা চাই—জমির মালিকের বাস্তবরূপ। জমির মালিক বলতে যাঁরা নিজ লাঙলে নিজ হাতে জমি চাষ করেন তাঁরা নন—যাঁরা অন্তত ৫০৲ পঞ্চাশ বিঘা জমিতে চাষ করান তাঁদের, এবং অসহায় ও অভিভাবকহীন-কৃষক পুত্রদের কথাও বলছি না। যাঁরা এর বেশী শত শত এবং হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক হয়ে কৃষি-মজদুরদের রক্তে পুষ্ট হচ্ছেন, তাঁদের কথাই উল্লেখ করছি। এদের অত্যাচারের প্রধান অস্ত্র তিনটি।

প্রথম—শ্রম-শোষণ করেন; তন্মধ্যে প্রধান শোষণ, বেকার খাটুনী আদায়।

দ্বিতীয়—ফসলের ভাগ-অপহরণ; তন্মধ্যে প্রধান, উৎপন্ন ফসলের অধিক শস্য আদায়।

তৃতীয়—অর্থ-শোষণ; তন্মধ্যে প্রধান, কৃষিকার্য নির্বাহের জন্য ঋণ দিয়ে উচ্চসুদ আদায়।

উপরিলিখিত শোষণ বন্ধ করবার জন্য একদিকে যেমন থানায় থানায় মজদুর-সমিতি কংগ্রেসকে স্থাপন করতে হয়েছে, সেইরূপ দেশের বর্তমানে পতিত হ'লেও কৃষিকাজের উপযুক্ত জমি যে ৫১ লক্ষ একর রয়েছে, তা অবিলম্বে চাষী-মজদুরদের প্রদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তা ছাড়া কর্ষণের অনুপযুক্ত জমি বাদেও পতিত জমি যে ৪৬ লক্ষ একর রয়েছে, তারও কিছু অংশ কৃষি-মজদুরদের দেওয়া যেতে পারে। এই ভাবে প্রয়োজনানুযায়ী যেমন জমির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে, সেইরূপ জমির উৎপাদিনী শক্তি বাড়াবার জন্য অবিলম্বে

৫০/ পঞ্চাশ বিঘার অধিক জমির মালিকদের নিকট থেকে বরাবর চাষী-মজুরদের জমিজায়গা প্রদান করার দিকে জনমত গঠন করা কর্তব্য। এখন প্রধান কথা হচ্ছে, বাংলার মজদুরদের পরিশ্রমের ক্ষমতা হীন হয়েছে ব'লেই দেশে আশানুরূপ ফসল ফলছে না। দ্বিতীয়ত মজদুরগণ ইচ্ছামত জমির উৎকর্ষ সাধন করতে পারে নাই ব'লে ক্রমাগত জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে। তৃতীয়ত, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও মরশুমী আবহাওয়ার উপর নির্ভর ক'রে কি প্রকারে মজদুরগণ নিজদের কল্যাণ সাধন করবে? অপর আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, মূলধনীদের টাকার অভাবে কৃষিকাজ কি চলতে পারে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, লাভ ও পড়তা ধ'রে বাড়তি আয়ের জন্যই মালিকরা এ কাজে লেগে আছেন। মজদুর-সমিতিকে লাভের বহরটাকে এ ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে ব'লে রাখছি, মজুরদের কদর ও চাহিদা নষ্ট করবার জন্য মূলধনীরা অনেক সময় বাংলার বাইরের মজুর আমদানী করেন। তারপর বাড়তি মূল্য পরিমাণমত উৎপন্ন করবার জন্য মজুর খাটাতে শুরু করেন। এতে মজুরের মজুরীর হার মালিকের সুবিধামত থাকতে বাধ্য হয়। অপর দিকে বাড়তি মূল্য পাওয়া মাত্রই মূলধনীরা নীরব থাকেন না, পুনরায় শ্রমশক্তি ক্রয় করবার জন্য নানাভাবে মূলধনকে নিযুক্ত করেন। এমন কি অধিক পরিমাণ ভূমিদাসকে খাটাবার জন্য অনাবাদী ভূমিকে আয়কর জমিজায়গায় পরিণত করেন। সেখানে মজদুররা এক শত টাকা উৎপন্ন ক'রে শতকরা কুড়ি টাকাও খাদ্যবস্ত্রের মূল্য পায় না অর্থাৎ দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সব মজদুর যে পরিমাণ মূল্য পায় তার চার গুণ অধিক বাড়তি মূল্য মূলধনীরা পেয়ে থাকেন। এইভাবে দেশের মজদুরগণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে ব'লেই অন্নের অভাব এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিগত দুর্ভিক্ষ

এইরূপ মূলধনীদের বিশেষ সহায়তা করেছে। তারই বিষময় ফলে মজদুরদের শিরদাঁড়া একবারে ভেঙে পড়েছে। এজন্য উৎপাদনের জমি, যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ তৎপর মজদুরদের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা চাষী মজুরদের শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব হবে না, ক্রীতদাস হতে হতে এরা একেবারে সর্বহারা হয়ে কৃষিকাজে ইস্তফা দিবে। প্রভুর অধীন রেখে শ্রমিকদের শ্রমের উপর বাঙালী সমাজ আর অধিক দিন নির্ভর করতে পারবে না। অর্থনীতির দিক থেকে এর বিচার করলেও স্বীকার করতে হবে সরকার ও জমির মালিক যে পরিমাণ লাভবান হচ্ছেন, তার অধিক পরিমাণ লাভ শ্রমিকদের সুখ শান্তি কৃষিশিল্প কার্য দ্বারা করতে পারবেন। কিছুদিন আগে বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগেই বাংলার জমিদারী ক্রয় সম্বন্ধে একটা জনমত গ'ড়ে উঠেছিল। এই সময়ে অনেকে মনে করেছিলেন রায়তদের বর্গা অধিকারকেও সরকার বাহাদুর ক্রয় করবেন। অর্থাৎ সরকারের খাস প্রজা গণ্য হয়ে মজদুররা কৃষি কাজ করতে পারবে। কিন্তু সাত মণ তৈলও পুড়ল না এবং শ্রীরাধার উদয়পুরী নৃত্যও দেখা গেল না। চাষীমজুরদের দিকে দু পক্ষের মতামত একটু তুলনা করলে বিষয়টা আরও সুস্পষ্ট হয়।

সরকার পক্ষের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ গার্নার রিপোর্ট দাখিল করলেন এইরূপ—

"রায়তের বর্গা অধিকার ক্রয় বাদ দেওয়া উচিত।"

জমিদার পক্ষের সার্ বিজয়চাঁদ মহাতব লিখলেন—

"যদি রায়তবর্গের বর্গাজমি জমিদারি ক্রয়ের পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে, তা হ'লে জমিদারবর্গের খাস জমি অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

মৌলবী ফজলুল হক (প্রধান মন্ত্রী) পরীক্ষা স্বরূপ বাংলা দেশের একটি জিলার জমিদারি ক্রয় করবার জন্য ঘোষণা করেছিলেন—

"গভর্মেণ্ট প্রথম দফায় সর্ব প্রকারের খাজনা সংগ্রাহকের অধিকার ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করেছেন। আপাতত বর্গাপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

অর্থাৎ মজদুরদের পরিশ্রমের ষোল আনা মূল্য সরকার জমিদার ও জমির মালিকগণ মোটেই ছেড়ে দিতে রাজী নন। নানা অজুহাতে রকমারি যুক্তির দ্বারা মজুরদের শ্রমকে মালিকের দ্বারস্থ ক'রে জমিদার, তথা সরকার লাভবান হতে চান। কিন্তু সরকার যদি বিলাতের মত মজুর-সরকার হন, তা হ'লে যাবতীয় দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত করতে চাইবেন। আর প্রভু-মালিক ও জমিদারগণ শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য বুঝবেন। বিলাতের মজুর-সরকার কথাটা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার না ক'রে রাশিয়ার উপমা দিলেই হয়তো ভাল হ'ত। কিন্তু উপমার ক্ষেত্রেই বিলাত সরকারের উল্লেখ করা হ'ল। কেন না, সকলকেই স্বীকার করতে হচ্ছে—আগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তারপর সমাজব্যবস্থা, আইন-কানুন ও অন্যান্য পরিকল্পনামূলক কৃষিশিল্প কাজ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া যেমন চাষী-মজুররাজ স্থাপন করা বাতুলতা, সেরূপ ভূমিদাস থেকে মুক্ত করতে না পারলে জাতি প্রকৃত স্বাধীন হ'তে পারবে না। আজ এই জনমত গ'ড়ে তুলবার জন্য চাষী মজুরদের সচেষ্ট করা প্রয়োজন। এতে পশ্চিম-বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ভাল হতে পারে। এক শ্রেণীর চেতনায় সমস্বার্থের মর্যাদাও ফিরে আসবে। সকলকে বুঝতে হবে, গণতন্ত্র মানে ম্যাজিস্ট্রেট, চেয়ারম্যান ও সার্কেল অফিসারের রাজত্ব নয়। ইংরেজরা দারোগা, ইন্সপেক্টর, সুপারিণ্টেণ্ডেট, পুলিশরাজ শুরু করেছিলেন। এখন প্রদেশপালকেও ভোটপ্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হতে হবে। জমিদার, মহাজন ও জমির মালিকরা যদি নিজেদের লাভ

বাড়িয়ে চলেন, তা হ'লে আমলাদের কলমের জোরে এ দেশের অধিক ফসল ফলবে না। দেশের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলবে। জমিদার উচ্ছেদ করবার জন্য দেশের নরনারী জাগ্রত হয়েছে। এ অবস্থায় বিহারে কংগ্রেস-মন্ত্রীগণ বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিম-বাংলার ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখনও কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি। তিনি বা কংগ্রেসের মাননীয় মন্ত্রীগণ যদি আজও গরীবের জন্য তেভাগা বিল, ঠিকা বিল, বাড়িভাড়া-নিয়ন্ত্রণ বিলগুলিকে শুধু শুধু যুক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখেন, তা হ'লে বিনা খেসারতে যাবতীয় ভূমি রাষ্ট্রকে অবিলম্বে যে গ্রহণ করতে হবে—এ কথা যেন বার বার স্মরণ করেন। তাই বলছি—(১) জমিদারি উচ্ছেদ চাই। (২) চাষীমজুরদের জমির উপর অধিকার চাই। (৩) অবিলম্বে খাস মহলের ভাগচাষীদের জমিতে স্বত্ব-স্বামিত্ব চাই।

দেশের চাকরান জমি, ও জায়গীর ভূমিতে সৈন্যগণ এবং গ্রাম-রক্ষীগণের অবাধ অধিকার ছিল। সে অধিকার আজ কোথায়?

বর্ধমান জেলা দোকান-কর্মচারী সম্মেলন

এতদিন দেশ দেশ ক'রে গুটিকতক ভদ্রলোক জমিদার মহাজন ও কলকারখানা এবং দোকানের মালিক দেশের কথা আওড়াতেন। ইংরেজের বিশেষ অনুগ্রহে দেশটা যেন একা এই সব মালিক শ্রেণীরই দেশ ছিল। দেশের শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের আয়ব্যয় ধনদৌলতের বিষয়ে তারাই যেন গভীরভাবে গবেষণা করতেন। এজন্য কতিপয় ভদ্রলোকের দাপটে গরীব কৃষক, মজুর, ভাগীদার, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার ও মেথররা এবং দোকান-কর্মচারীবৃন্দ মাথা তুলে কথা বলতে চাইতেন না।

কিন্তু ১৫ই আগস্ট থেকে সেদিনের অবসান হয়েছে। এজন্য আমরা অনেকেই বলছি, সেদিন আর নাই। এখন দেশের শতকরা ৮১ জন গরীবই দেশের মালিক হবে। কেন না, এ দেশের দুঃখীরা শুধু নিজেদের ঘাড় থেকে দুঃখের বোঝা ঝেড়ে ফেলবার জন্য জাগ্রত হয় নি, আজ পৃথিবীর দুঃখীর দল বাসুকী নাগের মত ফণা উদ্যত করেছে। বহুকাল বহুদিন অবনত মস্তকে এই নাগকুল মস্তকে পদাঘাত সহ্য ক'রে করুণার আশায় কাতরমলিন মুখে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু মালিকেরা সমুদ্রমন্থনের ন্যায় অমৃতের ভাণ্ডার করায়ত্ত ক'রে নাগকুলকে গরলের সাগরে নিমজ্জিত রেখে তাণ্ডবনৃত্য ক'রে চলছেন। তাই গরীবরা ভগ্ন জীর্ণ শীর্ণ অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে জীবন-মরণ পণ ক'রে ধরাপৃষ্ঠে স্থানলাভের জন্য আজ জাগ্রত হয়েছে—উদ্যত হয়েছে। পৃথিবীর চারিদিকে আজ এজন্য মালিকদের সংগঠনের যেমন অন্ত নাই, সেইরূপ প্রদেশে প্রদেশে মালিকদের নানা প্রহসনের ও বচনের বিরাম নাই। কারণ এই সব

মালিক দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করছেন—গণপরিষদের নব শাসন-তন্ত্রে তাদের স্থান কোথায় ?

আপনারা বহু বৎসর যাবৎ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, কলকাতার দোকান-কর্মচারীদের ন্যায় পশ্চিম-বাংলার ৯০টি ছোট বড় শহরের দোকান-কর্মীবৃন্দের সুবিধার জন্য আইনটিকে সংশোধন ক'রে এলাকা বৃদ্ধি করা হোক। কিন্তু এ কথা তখনকার আইনের মালিকরা কান পেতে শুনেন নাই। আজকে আপনারা কংগ্রেস-মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট যখন এ প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আগামী পরিষদ-অধিবেশনের সময় প্রস্তাবটি বিশেষভাবে তাঁরা বিবেচনা করবেন। কিন্তু তার আগে পশ্চিম-বাংলার দোকান-কর্মচারীকে দেশের কথা ভাবতে হবে। দেশকে গ'ড়ে তোলবার পথে এগিয়ে আসতে হবে, নতুবা মালিকদের চিরস্থায়ী দানপত্রমিদং কার্যঞ্চাগের আয়োজনের অবসান হবে না। দেশের জমিজায়গা কলকারখানার মালিকানাস্বত্ব হারিয়ে নিঃস্বত্ব সর্বহারা নিরন্ন হয়েই থাকতে হবে। আমি জানি, আমার দোকান-কর্মীবৃন্দের দুঃখ-বরণের মধ্যে দিয়ে এ দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সকল গ'ড়ে উঠেছে। যুদ্ধের মধ্যে ও অন্তেও নানাবিধ ক্লেশ সহ্য ক'রে জীবনের সমস্ত আরাম বিসর্জন দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং পরমায়ু দিয়ে দেশের দোকানগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আজও অনেকেই বুকের রক্ত দিয়ে মালিকের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত রয়েছেন, কিন্তু মালিকেরা অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ৪৫৲ টাকা আজও ধার্য করেন নাই। সপ্তাহে একদিন ক'রে ছুটি দিতেও অনেকে সম্মত হন নাই। রোগের সময়, দায়বিপদের মাঝে তাঁরা যমের দুয়ার দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দোকান-কর্মীগণ চোরাকারবারের দু-একটি সন্ধান দিয়েও কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন

নাই। দেশের অনেক মুনাফালোলুপ ব্যক্তি ব্যবসায়ে প্রচুর মূলধন খাটাচ্ছেন। শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় দোকান-কর্মীবৃন্দ তাদের নিকট ভদ্রোচিত ব্যবহার কামনা করেন, কিন্তু তাও তাঁরা পান না। অথচ ইন্‌কাম ট্যাক্স যাতে বৃদ্ধি না হয়, জাল-জালিয়াতির মামলায় এই সব মালিক যাতে জড়িয়ে না পড়েন, তার জন্য এই শিক্ষিত দোকান-কর্মীবৃন্দ কি না করেন! দেখা যায়, যখন কোনরূপ স্বার্থে একটু আঘাত লাগে, তখনই তাঁরা তাঁবেদার ও ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত চাকর নয় ব'লে এই সব শিক্ষিত কর্মীদের দূর ক'রে দেন। এজন্য দোকান-কর্মীদের (১) বাবু সম্প্রদায় (২) তাঁবেদার কুল ও (৩) ভৃত্যশ্রেণীর ন্যায় তিন প্রকার কর্মচারীর সৃজন হয়েছে।

এই সব দোকান-কর্মীবৃন্দের বর্তমান দুরবস্থায় কথা আলোচনা করলে দুঃখে হৃদয় ভ'রে ওঠে। কি অসহনীয় দুঃখ এবং চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাঁরা জীবনযাপন করছেন! উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে কেউ হয়তো সমস্ত দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পরে অনাহূত ও অবাঞ্ছিতভাবে কারও বারান্দায় রাত্রি যাপন করছেন। কিংবা কুকুর, ভিখারী, অনাশ্রয়ীর আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ-বা নোংরা বস্তির অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে স্ত্রীপুত্র নিয়ে স্বল্পপরিসরে ফুসফুসে ব্যাধিকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসছেন। পানীয় জলের, অন্নের ও বস্ত্রের জন্য পারিবারিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। স্বল্প বেতনে স্ত্রীপুত্র নিয়ে কেউ হয়তো আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ হয়তো ভাতে ভাত খেয়ে কোন রকমে টিকে আছেন। কেউ কেউ অল্প পয়সার হোটেলের ওপর নির্ভর ক'রে অকালে স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন। কেউ-বা মালিকের উচ্ছিষ্ট অন্নে কয়েকটি দিন পরিপুষ্ট হয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। মালিকদের নিকট আত্মীয় ব'লে অনেক

কর্মী তহবিলের টাকা বৃদ্ধির জন্য আত্মীয়তা দেখান। কিন্তু তাঁদেরও ম্যানেজারী এবং অংশীদারীর বোঝাপড়া বেশি দিন রক্ষা হয় না। তখন তাঁরা মনে মনে মুণ্ডপাত ক'রে মালিকদের কাছ থেকে সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করেন। তাই বলছি, মনের দিক থেকে, অবস্থার দিক থেকে আমার দোকান-কর্মচারী বন্ধুগণ—সকলেই গরীব পর্যায়ভুক্ত।

গরীবদের বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধ হবার দিন এসেছে। দেশের ভাগ্যকেন্দ্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে সকলের। কিন্তু দেশের স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হ'লে, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হ'লে—মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়ই কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হবে।

শিকড়ে জল না দিলে গাছ অকালে শুকিয়ে যায়, ব্যবসাক্ষেত্রে মরীরুহের যাঁরা স্বপ্ন দেখেন—তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, মালীকে ফাঁকি দিলে মালিককেও একদিন ফাঁকে পডতে হয়। জাতির মেরুদণ্ড এই ব্যবসা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান। এই মেরুদণ্ডকে রসসিঞ্চন ক'রে যারা সুস্থ সবল রাখছে, তাদের স্বার্থসংরক্ষণে সব রকমে সাহায্য করার জন্যে সরকার আজ বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন।

দোকান-কর্মচারী ভাইরা, আজ এগিয়ে আসুন—আপনারা আজ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশকে নব উৎসাহ দান করুন। মাভৈঃ!

ভয় ভীতি সঙ্কোচকে হৃদয় থেকে দূরীভূত ক'রে আপনারা যদি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মত দণ্ডায়মান হ'তে পারেন, তা হ'লে দেশের সমবায়ই যে সিদ্ধির মন্ত্র তা আপনাদের স্বীকার করতে হবে।

ব্যক্তিগত ভাবে কৃষিশিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে বর্তমানে কেউ আর বড় হতে পারেন না। সমবায় শক্তি অর্জন ক'রে আজ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার আহ্বান এসেছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করবার জন্য অভিযান শুরু করি। আমি বিশ্বাস করি, এইরূপ বীর সৈনিক দ্বারাই দেশের স্বাধীনতার স্বর্ণচূড়া নির্মিত হবে।

আপনারা আর কালবিলম্ব করবেন না। আইনত অধিকার আপনারা যদি অর্জন করতে চান, তা হ'লে আপনাদের ৯০টি শহরে উপস্থিত হয়ে আর্থিক উন্নতির সব কথা সকল কর্মীদের জানাতে হবে। সকলে মিলে একস্বরে দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে সর্বস্ব পণ ক'রে যদি নিজেদের দাবির কথা জানান, তা হ'লে শুধু মালিকরাই সে কথা কান পেতে শুনবেন না—সকলের উপরে যিনি মালিক, তিনিও সে কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠবেন।

দেশের বর্তমান অবস্থার মধ্যে গরীব দোকান-কর্মীবন্ধুদের অপর একটা অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা যেন জাতীয় সরকারের গঠনমূলক কাজে আত্মশক্তিকে উৎসর্গ করেন। সরকারী স্টোর এবং বেসরকারী খাদ্যবিক্রয়-ভাণ্ডার ও বস্ত্রের দোকান সকল সত্যই এখন দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। এই সব দোকানের মধ্যে কোন কোন দোকানের মালিক ও তাদের অনুগত কর্মীরা দুর্নীতির গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। সেই নরকতুল্য স্থান ত্যাগ ক'রে দোকান-কর্মীগণ যেন দিনমজুরের কার্য-গ্রহণ ক'রে উদরের জ্বালা নিবৃত্ত করেন। তা হ'লেই এই সব নরঘাতকতুল্য দোকানদারের আত্মচেতনা হবে। তারা বুঝবে, গরীব আজ সত্যিই ভূমিকম্প সৃজন করেছে। এইরূপ বসুমতীর কম্পন ব্যতীত দুর্নীতি ও সামাজিক অব্যবস্থা দূরীভূত হবে না।

সূর্যের আলোকের মত স্বাধীনতার আলোক। অন্ধকারতমসাচ্ছন্ন গরীবের পল্লীতে এই আলোক যেদিন উদ্ভাসিত হবে, সেইদিন দেশ ধন্য হবে। সেদিন আমাদের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি এবং মনের আনন্দ সর্বত্র প্রকাশিত হবে।

পচুই মদ কি খাদ্য ?

পচুই মদ খাদ্য নয়। এই মদের প্রধান উপকরণ চাল ও বাখর। বাখরে ১৬০ রকমের জিনিস থাকে। তার মধ্যে ৩০ রকমের গাছ-গাছড়া। ডাক্তার চোপরা লিখেছেন, এর মধ্যে এমনও অনেক গাছ-গাছড়া আছে, যা বিষতুল্য এবং উগ্র চাল থেকে ভাত তৈরি ক'রে বাখর মিশালেই চারদিন পরে মদ হয়। বাখরের উগ্র দ্রব্যে চাল প'চে চার দিনের মধ্যেই গন্ধ বেরুতে থাকে। সামান্য পরিমাণ রসি বা রস ভাসতে দেখা যায়। এই রসিতে সুরাসার শতকরা দু ভাগও থাকে না। অথচ অনেকে বলেন, ভিটামিন শর্করা ও শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পচুই মদে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে, বাখর যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যকে বিষময় ক'রে তোলে। এমন কি, বাখরের উগ্র গুণেই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে ; পা ঠিকমত ফেলতে পারে না ; পর পর ঠিকমত কথা বলতে পারে না, হিতাহিত জ্ঞান হারায়। তবুও হরিজনরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম ক'রে গরম জল সমেত পচুই মদ পান করতে চায়। তার প্রধান কারণ, এতে শরীরের সামান্য তাপবৃদ্ধি হয় ; দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান করে। এই লোভেই বা মাদকতায় হরিজনরা কাজকর্ম ছেড়ে গলা বাড়িয়ে হাঁ ক'রে মদ খায়। বাপ বেটার মুখেও মদ তিন হাত উপর থেকে ঢেলে দিয়ে আনন্দ লাভ করে।

বাখর মিশ্রিত পচুই মদ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক হতে দেয় না, যকৃত বৃক্ক পাকস্থলী ফুসফুস ও রক্তবহা নালীগুলির অনিষ্ট সাধন করে। তজ্জন্য হরিজনদের পরমায়ু দশ থেকে পনেরো বছর অযথা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তা ছাড়া পচুই মদের জন্যই শরীরের রক্তকণা রোগবীজাণুর সঙ্গে

ভালভাবে লড়াই করতে পারে না। মহামারী অতি সহজেই হরিজন-পল্লীতে শুরু হয়। দূষিত ব্যাধি ও অন্যান্য রোগের সুচিকিৎসার প্রতি এজন্য হরিজনদের দরদ নেই। কথায় কথায় মদ গাঁজা মুরগী প্রভৃতি উপচার মানসিক দিয়ে সাপ ভূত প্রেত ডান ডাকিনীকে সন্তুষ্ট করতে চায়। ফলে হরিজনদের দৈহিক ও আর্থিক দুর্গতি মোচন হচ্ছে না।

হরিজন বালিকারা মাতালদের খেয়ালে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। এমন কি, মাতালদের খেয়ালেই বহু-বিবাহ ক'রে থাকে। মাতাল স্বামীর বেদম প্রহার সহ্য করে। স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অত্যাচারে দিন-রাত চোখের জল ফেলে। সন্তানসম্ভবা হয়েও গতর না খাটালে খেতে পায় না। বিপদের উপর বিপদ বরণ করতে হয়। অশিক্ষিতা ধাত্রী বুড়ীরা প্রসূতিদের প্রচুর মদ ঝাল ও পিঁপুল খাইয়ে দেয়। সর্বরোগের মহৌষধ ব'লে মদের রসি পান করিয়ে রোগ ভাল করতে চায়। এই অত্যাচারের জন্য অনেক মেয়ে প্রসূতি-ঘরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে উন্মাদিনী হয়ে মাচায় ব'সে থাকে। আবোল-তাবোল ভুল বকলেও মাতাল স্বামীর চেতনা হয় না।

সভ্যতার আলোক হরিজন ও সাঁওতালদের মধ্যে আজও যে বিস্তৃত হয় নি, তার অপর একটি কারণ মাদকদ্রব্য। সাঁওতাল মেয়েরা মদ ও তাড়ি খেয়ে হাটে পথে বাজারে ও কলকারখানায় প্রায় বেসামাল হয়ে পড়ে। পশ্চিম-বঙ্গের মেলাগুলিতে সারারাত্রি মাদল বাজিয়ে নৃত্য করে। এতে সাঁওতালদের দৃঢ় সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে।

আবগারী বিভাগে পচুই মদ বিক্রির জন্য একটি বড় রকমের আয় হয়ে থাকে। এই টাকাটার লোভ সরকারের নেই বললে অন্যায় হয়। আড়াই সের চালে সাড়ে সাত সের মদ হয়। সাড়ে সাত সের মদের

দাম প্রায় ছয় টাকা। প্রায় দুই টাকা খরচ বাদে চার টাকা লাভ হয়। কমিশন বাবদ আবগারী বিভাগ ৩॥০ টাকা আদায় করেন। বাকি প্রায় ॥০ আনা পচুই মদের দোকানের শুঁড়িরা আজকাল পাচ্ছে। যদি আধ কোটি হরিজন বছরে গড়ে চার টাকার মদ খায়, তা হ'লে দুই কোটি টাকার অপব্যয় হরিজনেরা বছরে ক'রে থাকে। সে ক্ষেত্রে হরিজনদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য যথেষ্ট হতে পারে না। বে-আইনী ভাবে মদ চোলাই ক'রেও অনেক টাকা এরা নষ্ট করছে। সরকার বাহাদুর বলতে পারেন, এজন্য পুলিস আছে। কিন্তু সকলেই জানে, পুলিসের সর্বকনিষ্ঠ চৌকিদারও পচুই মদের মাতাল। তারাও মদ ধরতে গিয়ে কেউ কেউ আগে মদ হাঁড়ি থেকে বার ক'রে খেয়ে আসে—দরজার নিকট দারোগা হাতকড়া নিয়েও আর গোপন মদ তৈরি ধরতে পারে না।

শ্রীনিকেতন-পল্লী-সেবা বিভাগ, পচুই মদ খাওয়া ছাড়াবার জন্য প্রায় কুড়ি বৎসর আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। কারণ বীরভূম জেলার প্রায় পাঁচ লক্ষ হরিজনের সুসংঘবদ্ধ করার কাজে প্রধান বাধা পচুই মদ। শ্রীনিকেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কুড়ি বৎসরে হরিজনের গৃহে গৃহে মদ খাওয়া ও তৈরি করার বদঅভ্যাসের আংশিক প্রতিকার হয়েছে। ভোজে-কাজে বড় কেউ মদ খাওয়ার আয়োজন করে না বললেই হয়। কিন্তু দু হাজার গ্রামের মধ্যে প্রায় দুশো পচুই মদের দোকান খোলা থাকায় হরিজনদের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আজও আশানুরূপ দুর হয় নি। সত্বর পচুই মদের দোকানগুলি যদি সরকার বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে হরিজনদের বিশেষ উপকার করেন। তাতে অতি সহজে শিক্ষার প্রতি হরিজনেরা দরদী হতে পারে। কৃষি-শিল্পে উন্নত হতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হয়ে অকালমৃত্যুর প্রতিবিধান

কতে পারে। নতুবা পশ্চিম-বঙ্গের হরিজনদের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই গুরুতর সংখ্যাহ্রাস হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরেজরা সাঁওতাল-বিদ্রোহের পর এবং দেশের যুবক হরিজনদের-বুকের বল নষ্ট করবার জন্য পশ্চিম-বাংলায় প্রচুর মাদকদ্রব্য প্রচলনের বিহিত করেছিলেন। হরিজন ও সাঁওতালদের মধ্যে এজন্য ঘরে ঘরে মদ ও তাড়ি তৈরী করবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই লাইসেন্স ফী কম ক'রে পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে আদায় হয়ে থাকে, তার উপর লাইসেন্স নিয়ে গ্রামের বুকে বুকে এবং ছোট বড় শহরের মধ্যে পচাই ও তাড়ি বিক্রি হয়, পশ্চিম-বঙ্গের এ হতে জাতীয় সরকারের জমিদারী চালানোর মত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা আয় হচ্ছে।

কি কি বাবদ	১৯৪৭ আয় (৮ মাসের)	১৯৪৮ আয় (১২ মাসের)
১। ঘরে ঘরে পচাই তৈরীর লাইসেন্স ফী—	৩০ হাজার টাকা	৫০ হাজার টাকা
২। দোকান হতে পচাই বিক্রীর লাইসেন্স ফী—	২২ লক্ষ টাকা	৩৫ লক্ষ টাকা
৩। তাল ও খেজুর গাছের তাড়ি তৈরীর ট্যাক্স	৩ লক্ষ ৭০ হাজার	৪ লক্ষ ৩১ হাজার
৪। তাড়ির দোকান হইতে	৪ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১৯ হাজার
৫। এক হাঁড়ি মদের লাইসেন্স ফী—	১৲ টাকা	৩৲ টাকা

দুইটি জিলায় পরীক্ষামূলকভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন কাজ শুরু হবে স্থির হয়েছে। বীরভূমে কেন এখনও আবগারী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী

মহাশয় কাজ আরম্ভ করেন নাই তা জানি না। অন্যান্য প্রদেশ মাদকদ্রব্য বর্জন কাজ চালাবার জন্য কোটি কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করছে। আমাদের প্রদেশ কত টাকা ক্ষতি স্বীকার করবে তা আজও আলোচনা হয় নাই। অনেকে বলেছেন, আবগারী বিভাগে যখন তপশীলদের মাননীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন তপশীলরা আর মাদকদ্রব্য বর্জন বিষয় উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু তপশীলরা সরকারের নিকট গোলামীর বন্ধন মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে চায় মাদকদ্রব্যের ঘাটির উচ্ছেদ।

মাদকদ্রব্য বর্জনের ঘোরতর পক্ষপতী ছিলেন আমাদের ভূতপূর্ব প্রদেশপাল রাজাজী, তিনি এখন আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপাল।

আমি তাঁর সঙ্গে সিউড়ীতে মাদকদ্রব্য বর্জন বিষয় আলাপ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি এই কাজে গ্রামে গ্রামে কাজ করতে প্রস্তুত আছি। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার এবং শিশুদের মাদকদ্রব্য থেকে দূরে রাখবার বিষয় তিনি আলাপের সময় বিশেষ জোর দেন। যে সব ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী-পুরুষ মদ ছেড়েছে, জন্মাবধি খায় না, তাদের সংখ্যা যে উত্তর উত্তর বেশী হচ্ছে তার হিসাব রাখতে বলেন। ভারতের সর্বময় কর্মকর্তার এ মনোভাব সত্যই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

আরো সুখের বিষয় হরিজনরাই বর্তমানে মাদকদ্রব্য বর্জন কাজে উদ্যোগী হয়েছে। মেলাতে উৎসবে হরিজনরা মদ খেয়ে যে মাতলামী করত এবং পল্লীর এক-একটি মদ ও তাড়ির দোকানে এই উপলক্ষ্যে সমবেত হ'ত তা তারা সামাজিক নিয়ম ক'রে ও সরকারী সাহায্য দ্বারা বন্ধ করছে। আজ আমাদের দাবি—

(১) বারো মাসে ৩৩ দিন যাতে পচাই ও তাড়ির দোকান বন্ধ থাকে তার বিহিত করতে হবে। উৎসবে তবেই মদ উঠে যাবে।

(২) বিবাহে শ্রাদ্ধে উৎসবে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যদি ৫ জন লোক একত্রিত হয়ে মদ খায়, দণ্ডদানের বিহিত করতে হবে।

(৩) মদ বকশিশ এবং মানত-মানসিক এবং দক্ষিণাস্বরূপ যদি কেহ গ্রহণ করে অথবা প্রদান করে, দণ্ডদানের বিহিত করতে হবে।

(৪) প্রতি বৎসর তিনটি জিলায় অন্তত ব্যাপকভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন কাজ শুরু করতে হবে।

(৫) চারি ভাগের তিন ভাগ হরিজন ও সাঁওতাল কর্মীকে এই কার্যে অফিসার নিযুক্ত করতে হবে।

(৬) ঘরে ঘরে মদ তৈরীর পারমিট প্রথা বন্ধ করতে হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

'জয়হিন্দ'-মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মন্ত্রের ধ্বনিতে জাতির প্রাণশক্তি জাগ্রত করবার জন্য পশ্চিম-বাঙলার সেনাবাহিনীর কথা নিবেদন করছি।

স্বাধীন পশ্চিম-বাংলার সেনাবাহিনী

(বর্তমানে পশ্চিম-বাংলার নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নাই—বিদেশী আমলে যোদ্ধাজাতি বলে বাঙালীকে স্বীকার করা হয় নি ব'লেই কোন সেনাবাহিনী এখানে গ'ড়ে ওঠে নি—কিন্তু বিদেশীদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতিতে কিছু আসে যায় না—ইতিহাসের পাতা ও'ল্টালে বাঙালীর বীরত্বের নজির অনেক পাওয়া যাবে—ধর্ম-মঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে যুদ্ধের যে সব বর্ণনা দেখা যায়, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলার বাহুবল চিরদিনই এমন নিস্তেজ ছিল না। আজ দেশ হয়েছে স্বাধীন, স্বাধীন দেশের কর্তব্য নিজস্ব একটি সেনাবাহিনী গ'ড়ে তোলা।)

পশ্চিম-বাংলায় সৈন্যদল গঠনের কাজ আজও সর্বসাধারণের মনঃপূত হয় নি। স্বাধীন বাংলায় পল্লীতে পল্লীতে যখন সৈন্যদল থাকত তখন দেশের কৃষিশিল্পের এমন শোচনীয় অবস্থা ছিল না। সৈনিকেরা অবসর-সময়ে হাতের কাজ করতেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নাকড়া বাজিয়ে রণশিঙ্গা ফুঁকে দামামা বাজিয়ে যুদ্ধে যোগদান করতেন। রা-রা শব্দে তখন পল্লীর প্রাণ নেচে উঠত। সৈনিক-পরিবারে বীর নারী বীর স্বামী-পুত্রদের রণসাজে সাজিয়ে দিতেন। এক-একটা গড থেকে রণবাদ্য বেজে উঠত। বড় বড় জমিদার ও রাজাদের এবং নবাবকে এজন্য বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হ'ত না। জমি-জায়গায় অবাধ স্বাধীনতা লাভ ক'রে তাঁরা দুঃখের ভাত সুখে খেতেন। রাজ-ভাণ্ডার থেকে নামমাত্র অর্থ সাহায্য করা হ'ত। কিন্তু রাজশক্তি তাঁদের পেছনে থাকত সব সময়েই। এজন্য তাঁরা ইচ্ছামত গ্রাম ও নগর গ'ড়ে তুলতে পারতেন। পল্লীর জলাশয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়,

দেবালয়, হাটতলা, রথতলা, মেলা, খেলাধুলা ও উৎসবাদি নবরূপ ধারণ করত। সৈন্যরাই রায়বেঁশে নাচ, সামরিক খেলাধুলা ও কসরতাদি দেখিয়ে জনসাধারণকে আনন্দ দান করতেন, সামরিক উন্মাদনা ও উদ্দীপনা যোগাতেন। জনসাধারণ এজন্য রণজয়ের পর তাঁদের বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিতেন, খেলাধুলা পরিদর্শনের সময় পুরস্কৃত করতেন। মোট কথা, তখন বাংলা দেশের যুদ্ধ সত্যি সত্যিই জনযুদ্ধ ছিল, কারণ সে যুদ্ধের জয়পরাজয়ের সঙ্গে জনসাধারণের ছিল অন্তরের যোগ। বিদেশী সৈনিকের সাহায্যে যুদ্ধের সময় আধুনিক রণকৌশল হয়তো স্থান পেত না, কিন্তু সাধারণ সৈনিক এখনকার চেয়ে তখন আরও উন্নত অবস্থায় ছিল। সৈন্যদের খাদ্য, বাদ্য, বসন ও বাসস্থান সমস্যা এত উৎকট হয়ে পড়ত না। পল্লীতে পল্লীতে যোদ্ধা-জাতির স্ত্রী-পুরুষ যোগ্য সম্মান লাভ করতেন, তাঁরা নিজেদের শক্তি দিয়ে এক-একটি দুর্গ নির্মাণ ক'রে তুলতেন।

আগেকার বাংলা

আজ স্বাধীন পশ্চিম-বাংলার আকার যেমন ক্ষুদ্র হয়েছে, সেরূপ নানা কারণে পশ্চিম-বাংলার পূর্বতন সৈন্যদল অস্পৃশ্য এবং অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। সৈনিক বিভাগে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর কোন স্থান নেই এবং পুলিস বিভাগেও পশ্চিম-বঙ্গবাসী নামমাত্র স্থান দখল করেছে। ব্যাঙ্কের দারোয়ান, জমিদারদের পাইক-পেয়াদা, এমন কি আপিসের পিয়ন-চাপরাসী প্রভৃতির স্থানেও অ-পশ্চিমবঙ্গবাসী। অবশ্য বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও পূর্ববঙ্গ পশ্চিম-বঙ্গেরই সংলগ্ন। এসব জায়গার মানুষের সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর নাড়ীর সম্পর্ক আছে। এ আত্মীয়তাকে ছিন্ন ক'রে আজকের দিনে জাতি সুস্থ সবল ও বলিষ্ঠ হবে না। কিন্তু পশ্চিম-

বাংলার সৈন্যদল যদি খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে মৃতপ্রাণ হয়ে পড়ে, তা হ'লে যে কোন সম্পর্ক এবং কোন আত্মীয়তাই স্থান পাবে না, তা সকলেরই অনুভব করা উচিত।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার এলাকা ছিল আসাম ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে। রাজা ধর্মপাল বিহারের দন্ত-ভুমিতে রাজত্ব করতেন। মহীপাল উত্তর-রাঢ়ে ও রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ে এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। আজ সেই বৃহৎ এলাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে মাত্র ১৩টি জিলায় ২ কোটি ৫২ লক্ষ লোকের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ সীমাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে আজ প্রায় ২৫ লক্ষ যোদ্ধাজাতি। এদের নাম ব্যগ্রক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, বীরবংশী, বাউরী, হাড়ী, ঋষি, রাজবংশী, সাঁওতাল ও কোড়া উপজাতি। এই সমস্ত এক-একটি উপজাতির ইতিকথা সত্যিই জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। অবশ্য ইতিহাস-লেখকগণ তখনকার দিনে এদের বিশেষ কোন মর্যাদা দেন নি। গ্রামের কবি ও পল্লী-সাহিত্যিকগণ যে ভাবে ও যে ভাষায় এদের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, আজ সেই সব সোনাপাংশু জাতিদের ধূলোবালি থেকে উদ্ধার ক'রে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

মঙ্গলকাব্য

ধর্মমঙ্গলে জাগরণ পালায় সৈন্যদলের অভিযানের যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, স্বাধীন পশ্চিম-বাংলায় তা অনেকে জানে না।

কালুর সোদর কানু ভাট গঙ্গাধর
দক্ষিণ হাজরা হবি উত্তর কান্তর।

ঝোপ ঝাপ কানন কাটিয়া রাখে থানা
ওত পেতে বীর কালু পাছে দেয় হানা।
পাত্র বেড়ে রহিল অপর যত বীরে
চৌদিকে চঞ্চল চৌকি ইঁদামেটে ফেরে।
আগে আগে বেন-দার বাঁধিল হাড়কাটি
চারিদিকে কাটগড়া কোণে তার হাতি।
কাণে কাণে রাইত পশ্চাৎ ঘোড়া রাখে
ঢালি পিছে ধানুকী বন্দুকী বাকী থাকে।
কাথি হাড়ি কামিনী কামান ধরে রয়
তবু পাত্র ভাবে মনে ডোমনীর ভয়।
পাত্র বলে সাবধানে সবে রাখ থানা
দণ্ড দুই দেখি তবে রাত্রে দিব হানা।
এত বলি গড় বেড়ে রহিল পাত্রর
বিপত্তি সাগরে ভাসে ময়না নগর॥—ধর্মমঙ্গল

সকলেই জানে জাগরণ পালার নায়ক কালুবীর। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীদেবী। আক্রমণকারীর নাম মহানদ। ইনি গৌড় থেকে বিষ্ণুপুর এবং বীরভূমের অজয় নদের তীরে সৈন্যদের নিয়ে এসেছেন। পল্লী-কবি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন—

ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে
শত শত সেনায় সংহারে ফলা বাটে।
বাণ দেখি লখের নক্ষত্র যেন ছুটে
গুরুগিরি গরিমা গর্জেয় গর্ব টুটে।

* * *

আগু চলে আগু হয় চঞ্চল যত ঢাল ঢালি
লখের সমরে যোঝে যোন শত ফালি
ডোমনী আটুনী করে বিঁধে হাটু পেড়ে
ফিরে ফিরে ফলঙ্গা ফলায় ফেলে ঝেড়ে।
লখের নিষ্ঠুর বাণ বাজে যার গায়
জ্বালায় জীবন যায় জল খেতে চায়।

নারীসেনা

বাংলার নারীদের কয়েক বৎসর আগে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে এবং আজও বাংলার নারী প্রতিদিন যে আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে রয়েছে, তার একমাত্র প্রতিকার নারীসৈনিক দল গঠন। বহিঃশত্রু এবং পল্লী-শত্রুর আক্রমণ থেকে নারীরা যদি নিজেরা আধুনিক রণবিদ্যায় সুসজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, তা হ'লে বাঙালীর আত্মমর্যাদা বিপন্ন হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না। পশ্চিম-বাংলার বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে এবং বয়স্কদের জন্য সত্বর রণ-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন সেইরূপ মেয়েদেরও রণবিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক।

ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ভূমিজ, বাউরী, বীরবংশ, রাজবংশ, হাজরা, ঋষি প্রভৃতি ২২ লক্ষ ১ হাজার নরনারীর মধ্যে খুব কম ক'রে ১০ হাজার স্ত্রী-পুরুষ এবং ৫ হাজার যুবক-যুবতীকেও সামরিক শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রাচীন পল্লী

পশ্চিম-বাংলাকে গৃহ-শত্রু এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে রক্ষীদলের প্রয়োজন। ৭০০ মাইল ব্যাপী নদ নদী খাল বিল ডাঙা ডহর বন পল্লী ও সহর সমূহ রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। পশ্চিম-বাংলার জনপ্রিয় মন্ত্রী মহাশয়দের এজন্য কঠোর সমালোচনার

সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রের শক্তি ও অর্থের যে অপব্যয় হচ্ছে না—এ কথা বলা যায় না। আজ তাই পশ্চিম-বাংলার অনাবাদী পতিত এবং ভিটা-মাটিতে সৈন্য-শিবির পল্লীর স্থাপনের কথা আলোচনা করছি।

বিশ্বভারতী-পল্লী-সংগঠনবিভাগের বোলপুর স্টেশনের চার মাইল দক্ষিণে সুপুরগ্রাম। এই গ্রামটা সাতটা পল্লীর আদর্শস্থল ছিল। আঠারো পল্লীর আঠারো প্রকার কৃষি-শিল্পজীবী চিকিৎসক এবং শিক্ষকগণ বসবাস করতেন। কম ক'রে গ্রামে ২৫ হাজার জনসংখ্যা ছিল। গ্রামের দক্ষিণে এক মাইল মধ্যে অজয় নদের একটা বন্দর ছিল। নুন মসলা নীলকুঠীর তাঁতের কাপড়চোপড় ও নীল প্রভৃতি চালান যেত। কোন কোন জিনিস আমদানিও হ'ত। সুপুর থেকে বর্ধমান রাণীগঞ্জ দুমকা কাটোয়া মঙ্গলকোট প্রভৃতি যাবার পাকা রাস্তা ছিল। গ্রামে হাট ছিল, বাজার ছিল। রথতলায় রথ, নারিকেল উৎসব, দোল উৎসব, রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা বসত। প্রায় লক্ষ জনের সমাগম হ'ত। যাত্রা কীর্তন, বাউলগান ও কথকতা বারো মাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা ছিল। রায়বেঁশে নৃত্য, মল্লযুদ্ধ, যাদুবিদ্যা দেখবার জন্য বহুজন উপস্থিত হতেন। বহুরূপী তাড়কা রাক্ষসী বেশে গ্রামে প্রবেশ করে এক আনন্দের রোল তুলত। প্রহসন ও কৌতুক দেখবারও অভাব ছিল না। সব কিছু সহজ সরল উপায়ে সুসম্পন্ন হ'ত। এর কারণ কি?

গ্রামের কর্মী

বীরভূমের ইতিহাসে দেখা যায়, বর্গীদের অত্যাচার বীরভূমে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই সময় শক্তিশালী বীরযোদ্ধা নিয়ে আনন্দচাঁদ গোস্বামী সুপুরে একটা গড় নির্মাণ করেন। এই গড়ের মধ্যে সৈন্যেরা শরীরচর্চা করত, লাঠি ও তলোয়ার খেলা শিখত। স্বাধীন

বাংলার বীর যোদ্ধারা রণবিদ্যা গোপনে শিক্ষা দিতেন। মানকর অঞ্চলে যেসব বীরবংশী নদীতীরে অবস্থান করতেন, তাঁরা এখানে এসে আশ্রয় নেন। তখন ভল্লা, মাল, বাউরী, হাজরা প্রভৃতি জাতিগণ প্রাণ ভয়ে ভীত। বৌদ্ধ সাধকগণ ও দেশসেবকগণ হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তারা দলে দলে আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নেতৃত্বের সংবাদ পেয়ে সুপুর গ্রামে সমবেত হন। গোস্বামীজী এদের সংস্থানের এবং বসবাসের জন্য বিনামূল্যে ভূমিদান করেন। কৃষিশিল্পকাজে নিযুক্ত করেন। বর্গীদের লুঠের সংবাদ পেলেই এদের নিয়ে রা-রা শব্দে গড় হ'তে মশাল জ্বালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লড়াই করতেন। মুচিপাড়া থেকে বাজনা বেজে উঠিত। বাজুনে ডোমরাও সানাই কাঁসি বাজিয়ে গ্রামবাসীদের প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দান করত।

এই গড়টার চারিদিকের যে প্রাচীর ছিল, তার এলেকা প্রায় দুই মাইলব্যাপী আজও দেখা যায়। গড়ের ভিতরে জলাশয়. দেবালয় ও বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান আজও রয়েছে। এই গ্রামের মধ্যে দিগড়া চাখরান লাখরাজ নিষ্কর প্রভৃতি জমির পরিমাণ দুই হাজার একর। আউস, আমন ও দো-ফসলের জমি এক হাজার একর। মোট তিন হাজার একর জমিতে খাদ্যশস্য, মৎস্য, ফল, শিল্প দ্রব্যের কাঁচামাল ও জ্বালানী সকল উৎপন্ন হয়ে থাকে। গ্রামের বর্তমানে ৬০ ঘর এই সব জমি-জায়গার মালিক। গ্রামের জমিদার এবং দরপত্তনিদারগণ অধিক আয়ের পথেই ধাবিত। তারা সকলেই শহরে আশ্রয় নিয়েছেন। যোদ্ধারা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ এবং অভাবে নির্বংশ হয়েছে। আঁকর বাবলা শর এবং কাঁটাগাছে গ্রামটি বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ। প্রায় এক হাজার একর ফল ফুলের বাগানে সাঁওতালেরা আশ্রয় নিয়েছে। তারা জমি চাষ করে। ভাগীদার মাহিনদার এবং মজুররূপে যা মজুরী পায়

তাতে তাদের চার মাসের বেশি খাবার হয় না। গ্রামের জমিতে ভূমিতে বাগানে কোন অধিকার এদের নাই। ৪৩টি জলসেচের জন্য যে জলাশায় খনন করা হয়েছিল তা মাটি প'ড়ে বুজে গেছে। জলসেচের ব্যবস্থা নালা; রাজনালা, রাজপথ, গোচর মাঠ প্রভৃতি যা কিছু সাধারণের সম্পত্তি ছিল তা এখন দরপত্তনিদারের নিজস্ব সম্পত্তি হয়েছে। গ্রামটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় এখন এই গ্রামকে সমতল করা ভিন্ন অন্যপথ নাই।

সৈন্যশিবির-পল্লী

এই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত পল্লীর যদি অন্তত সাড়ে শত শত একর ভূমির উপর রক্ষীদের বসানো যায়, তা হ'লে কম ক'রে এক শত জন যোদ্ধা বা রক্ষীদল চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৫০০ একর জমিতে কৃষিকাজ এবং ১০০ একর ভূমিতে বাসস্থান এবং ১০০ একর জমিতে শিল্পভবন ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও ৫০ একর ভূমির উপর রাস্তাঘাট জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে এক-একটা পল্লী স্থাপন করা দুরূহ কাজ নয়। দামোদর অজয় কংসাই ও গঙ্গাতীরে এইরূপ অনাবাদী ভূমি প্রচুর রয়েছে। জলাভূমি ও ডাঙাডহর বন-সমূহকে এইভাবে কার্যকরী করলে দেশের আয় বাড়বে। মোটা খাওয়াপরার দুশ্চিন্তায় নিঃস্ব নিরন্নদের আকুল হতে হবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার কথা

হরিজনরা নোঙরা। এদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। যমে ধ'রে টানাটানি না করলে ডাক্তার দেখায় না। এদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা সকলের পক্ষে সুদূরপরাহত। তার উপর পানীয় জলের

উপায় এরা পায় না। অস্বাস্থ্যকর স্থানে আবর্জনার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। বস্তির মধ্যে যারা অবস্থান করে, তারা বড়লোকের পায়খানা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট স্থানে পতিত থাকে। সৈন্যশিবির-পল্লীর এজন্য (১) রোগীর সেবা ও চিকিৎসা, (২) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্তের প্রতিবিধান, (৩) যক্ষা কুষ্ঠরোগ এবং দুষিত ব্যাধির আক্রমণ হতে রক্ষা, (৪) •ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও সরল নিয়ম সকল পালনের জন্য বিধি ব্যবস্থা করা (৫) দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্য ব্যবস্থা ও শরীরচর্চা এবং খেলাধূলা শিক্ষা প্রদান করা বড় কাজ। একাজে সাধারণত কারো কোন দরদ নাই—এজন্য গরীব শুধু শুধু গতর খেটে মরে। গ্রামের রাস্তা-ঘাট বিদ্যালয় ও রাজনালা সংস্কারের জন্য এরা গতর খাটায়, কিন্তু এদের পল্লী পরিষ্কার করাবার জন্য বড কেউ উৎসাহ দেয় না। মেথরপল্লী, ডোমপল্লী, মুচিপল্লীগুলি এজন্য সত্যই ভয়াবহ হয়ে রয়েছে। সেখানে এক দিকে রোগের বীজাণু, অপর দিকে অস্বাস্থ্যকর দুষিত দ্রব্য বিরাজ করছে। এ অবস্থায় কেউ অধিক দিন বাঁচতে পারে না।

রক্ষীদল প্রতিদিন পালাক্রমে এর প্রতিবিধান করবে। রক্ষীদল প্রতিদিন সহজ সরল উপায়ে নিজের দাঁত নিজে যেমন পরিষ্কার করে সেইরূপ গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধান করবে। এখানের জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটবে, এখানের প্রতি গৃহে ফলফুলের বাগান থাকবে। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ থাকবে। মাঝে মাঝে নিরাভরণ ডাঙার উপর কচি ঘাসের উপর এরা নির্মল বায়ু বিশুদ্ধ পানীয় জল ও নির্মল আনন্দ লাভ করবে। ছেলেমেয়েরা পচা দুর্গন্ধে ধূলাবালির মধ্যে তা হ'লেই আর পতিত থাকবে না। হরিজনদের প্রতিটি গৃহে জানালা থাকবে। খড় দিয়ে পাতা দিয়ে এদের গৃহের

আচ্ছাদন হবে না। এরা টিনের ন্যায় গৃহের আচ্ছাদন দিয়ে অন্তত কুড়ি বছরের মত নিশ্চিন্ত হবে। প্রতি বৎসর এদের গৃহের ছাউনি হাওয়ায় উড়ে যায়। নূতন রাষ্ট্র নূতন বিধিব্যবস্থা দ্বারা এদের ঘরকে যদি উত্তমভাবে নির্মাণের বিহিত না করেন তা হ'লে স্বাধীনতার অর্থ কি কেউ বুঝবে?

শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

সরল কৃষি ও শিল্প শিক্ষাদানই এই সব পল্লীর প্রধান কর্তব্য হবে। ছয় বৎসর থেকে বারো বৎসরের ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাবে। ১৩ বৎসর থেকে ৪৫ বৎসরের যুবকদের সামরিক, কৃষি ও শিল্প শিক্ষা হাতে-নাতে দিতে হবে। মেয়েদের হাতের কাজের ও মৌখিক উপদেশের এবং লিখিত পঠিত বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ম্যাজিক লণ্ঠন, সিনেমা, বেতারবার্তা দ্বারা এদের নব নব আদর্শ দানে ফল ভাল হবে। পুস্তক পাঠ ক'রে, সংবাদপত্র শুনিয়ে বয়স্কদের শিক্ষা-কেন্দ্রকে প্রাণবন্ত করতে হবে। গানের জলসার এবং সাহিত্য, সমাজ ও কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয় ছোট ছোট ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী দ্বারা বয়স্কদের জ্ঞানবৃদ্ধির আয়োজন করা একান্ত দরকার। এখান থেকেই ডাক্তারী, কারিগরী ও উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত ক'রে দেশবিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা হবে। উড়োজাহাজ, জল-জাহাজ এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য পল্লীর নরনারী বীরপুত্র, স্বামী ও আত্মীয়দের প্রেরণ করবেন। মেয়েরা যুদ্ধের খাদ্য, সাজসজ্জা, বাদ্য ও চিত্তবিনোদনের যাবতীয় আয়োজন করবেন। আহত এবং রোগীর সেবা করাই মেয়েদের ব্রত হবে। মেয়েরাই অশিক্ষার আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করবে। এতে পশ্চিম-বাংলাদেশে অতীত দিনের যোদ্ধা-জাতির মধ্যে থেকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সৈনিকদল গ'ড়ে উঠবে।

পশ্চিম বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্র

যে জঘন্য সামাজিক প্রথা, যে বর্ণবিদ্বেষ পশ্চিম-বাংলায় হরিজনদের সমাজ থেকে অপাংক্তেয় ক'রে দূরে ঠেলে রেখেছে, তার বিলোপ-সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জাতির মেরুদণ্ড, সমাজের বৃহত্তম শক্তি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ও পেষণে এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। আজকে এদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে স্বাধীন পশ্চিম-বাংলার সৈনিকদল-গঠন-পরিকল্পনা স্বপ্নই থেকে যাবে। নীচে বাংলার বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে ভেদ ও বিভাগের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হ'ল, তা থেকে বেশ ভাল ক'রে বোঝা যাবে যে, বাংলার সমাজ ভাগ হতে হতে কোথায় গিয়ে পৌছেছে! তপশীলী ছাড়াও শূদ্র, এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যে এত ভাগ রয়েছে—যাতে সমাজ-ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে।

এই বিভেদ দূর করার পথে প্রধান বাধা, উচ্চবর্ণের মধ্যে শূদ্রের ৬৫৬টি এবং তপশীলীদের ৭৫টি জাতি। হিন্দুসমাজের নেতা, গুরু, পুরোহিত, সেবক ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ জন। ব্রাহ্মণের মধ্যেও সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণী, বৈদিক, গ্রহবিপ্র, পীরালী ও বর্ণের পতিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নামে বিভক্ত। এদের কারও সঙ্গে কারও বিবাহাদি হয় না। গ্রহবিপ্রাদি ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয়। অপর দিকে ইংরেজেরা অবাধে দেশের এই সব যোদ্ধাজাতিদের ওপর কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি লেলিয়ে দিয়েছিল। তাই এই রায়বেঁশে দলের অধিকাংশই বিখ্যাত ডাকাত ব'লে পরিচিত হয়েছে। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এদের যুদ্ধ-চর্চাকে ধামা চাপা দিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ

কিন্তু দেশের জনসাধারণ এদের সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুলতে চায়। এদের ঘরে ঘরে আজও ঢাল-তলোয়ার, সিঙ্গা-নাকাড়া দেখা যায়। সাঁওতালরা তীর ধনুক বর্শা আজও ত্যাগ করে নি। শিকারী জাতি শিকার পেলে সব কিছু ত্যাগ ক'রে বনে বনে ছুটে বেড়ায়। এদের ঘরের দেওয়ালে আঁকা থাকে বিজয়ী শিকারীর মূর্তি। ইংরেজ এদের ইচ্ছে করলে আধুনিক রণবিদ্যায় বিশারদ ক'রে এতদিন মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু সেদিকে ইংরেজ ইচ্ছে ক'রেই কিছু করেন নাই। সমাজ সংস্কার নামে যে সব আইন করেছিলেন তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জমিদার উচ্ছেদের নামে কমিশন বসিয়ে বৎসরের পর বৎসর বিদ্রোহের আগুনকে দমিয়ে রেখেছে। পশুর মত জঘন্য জীবনযাপনের জন্য ষড়যন্ত্রের কসুর করে নাই। তাই কলকারখানার পাশে হতভাগারা তিলে তিলে মরে। গ্রামের গোভাড়াড়ে মৃত পশুর মত পতিত থাকে, শৃগাল কুকুরের মত একদল নরপিশাচ এদের রক্ত টেনে ছিঁড়ে চুষে খায়। এ দুঃখ যারা অনুভব করেন তাদের সমাজে কোন স্থান নাই, রাষ্ট্রে তাদের অধিকার নাই, কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে তারা নির্বাসিত। এজন্যই হাজার হাজার বৎসরব্যাপী অস্পৃশ্যতা বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন,—

“তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।”

১৯৩০ সাল, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ইংরেজের কারাগারে বন্দী। কারাগারের লৌহ কপাটের পাশে জেলের কম্বল বিছিয়ে কলম ধ'রে আছেন। পল্লীর জলবায়ু, মাটি, গাছপালা,

জীব জন্তু সব তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর দরদী হৃদয় কেঁদে উঠেছে। শিল্পী তাঁর তুলিকার স্পর্শে এক-একটি ছবি এক-এক দিন এঁকে চলেছেন, এইভাবে কারাগারে তারাশঙ্করের এক-একটি দিন সাধনায় সার্থকতা লাভ করেছে। সেদিন জানতাম না যে, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর দেশের হাড়ি, ডোম, বাগদীর কথায় বাংলার সাহিত্য-মন্দিরকে এমন ক'রে চঞ্চল ক'রে তুলবেন। তাঁর বীরভূমের বীর মাটি, তাঁর লেখা "পাষাণ পুরী" "কালিন্দী" এবং তাঁর কল্পনার "কবি"র বংশধরগণ দেশের ডোম হাড়ি বাগদীরা আজও জীবিত। তারা আজও তারাশঙ্করকে চিনবার এবং জানবার মত শক্তি অর্জন করে নাই সত্য, কিন্তু এর এন্য দায়ী তারাশঙ্কর নন, রবীন্দ্রনাথ নন, বঙ্কিমচন্দ্র নন,—দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়, দায়ী ইংরেজ। ইংরেজরা চেয়েছিল দেশের হাড়ি বাগদী ডোমদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বীপ থেকে পৃথক ক'রে দ্বীপান্তরে রাখতে এবং প্রয়োজন হ'লে দ্বীপান্তরে চালান দিত। কালী বাগদীর কিছু কথা তারাশঙ্করের দ্বীপান্তর নাটক থেকে তাই উল্লেখ করছি—

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড!

উচ্চহাস্য

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। চুপ কর্, স্থির হ।

কালী। বড়বাবু, তুমি আমার মনিব, আমার ভাই, একটা উপকার কর হুজুর। জজ সাহেবকে ব'লে আমার ফাঁসির হুকুম

করিয়ে দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে, কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?

ধনদা। ভগবানের নামকে সম্বল কর কালী—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না, না, না। তার নাম তুমি আমার কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি করব? কি হবে? সে আমার কি করেছে? কি দিয়েছে?

ধনদা। না না কালী, ও কথা বলিস নি। তাঁর বিধান—

কালী। তার বিধান? ভগবানের বিধান!

উচ্চহাস্য

ধনদা। কালী!

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মকে ভৈরবী করিয়েছিলে—

ধনদা। কালীচরণ, আমাকে ক্ষমা কর্। ওরে, আমাকে তুই ক্ষমা কর্।

কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায়, আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগদী; যার বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, ঘরে সিন্দুকে এত আসবাব, এত ধন, তোমাদের এত সুখ, আর আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল

পড়ে, পোষ-পার্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেরিয়ে চ'লে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পার বড়বাবু, তার বিধানে কেন তুমি দুধে ভাতে পেট পুরে খাও, ফেলে দাও, পোষা কুকুরকে দাও, তবু তোমার ফুরোয় না? আর আমি কেন একবেলা আধপেটা খেতে পাই না, স্ত্রী-পুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না? কেন? কেন?

ধনদা। অপরাধ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান মানুষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙে যাবে।

কালী। **কবে? কবে? কবে?**

শ্রীনিকেতনের সাঁওতাল ব্রতী দল